রবীন্দ্রনাথের
কিশোর-সাহিত্য
অরবিন্দ পোদ্দার
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্য

অরবিন্দ পোদ্দার
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ানা
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৬৬ সনের ১লা অগ্রহায়ণ (১৮. ১১. ১৯৫৯) ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটের
'ইণ্ডিয়ানা'-র পক্ষ থেকে শ্রীগুরুপদ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ রূপায়ণ
॥ শ্রীমণীন্দ্র মিত্র ॥

দুই টাকা পঞ্চাশ
নয়া পয়সা মাত্র

পি-১২, নিউ সি, আই, টি রোডের 'এশিয়ান প্রিন্টার্স'এর পক্ষ থেকে
শ্রীদুলভ কুমার বসু কর্তৃক মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্য

অরবিন্দ পোদ্দারের অন্যান্য গ্রন্থ :—

বঙ্কিম মানস
শিল্পদৃষ্টি
মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্য যুগ
উনবিংশ শতাব্দীর পথিক
রবীন্দ্র মানস

ভূমিকা

পুস্তকাকারে রবীন্দ্রনাথের শিশু বা কিশোর-সাহিত্য কখনও আলোচিত হ'য়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই, যদিও এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবত তার কারণ এই : রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনা যে মর্যাদা, শিল্পগুণ ও ভাব-ঐশ্বর্যের অধিকারী, শিশু এবং কিশোরদের উদ্দেশ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির অধিকাংশেরই সে অধিকার নেই। সেজন্য, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশ্লেষণে এরা অনেকটা অপাংক্তেয় হয়ে রয়েছে। হয়ত বা এই সব গ্রন্থের আলোচনা রবীন্দ্র মানসের উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়কও নয়।

একথা অবশ্য স্বীকার্য, কিশোর অথবা শিশুদের জন্য রচিত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার শিল্প-মান সমান উঁচু নয়। তাতে এমন রচনাও রয়েছে যা কবি না লিখলেই ভাল হতো। অপর পক্ষে, তাঁর কোন কোন রচনা উপস্থিত প্রেরণার দাবী উত্তীর্ণ হয়ে রসের দাবীতে আবেদনের সূক্ষ্মতায় সর্বকালের দরবারে প্রসারিত। সে সব রচনার আনন্দ যেমন শিশুর তেমনি প্রবীণের। অবশ্য, এ শ্রেণীর রচনা যে সংখ্যায় অল্প তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের প্রাজ্ঞমনের নিকট শিশুর সারল্য একপ্রকার অনায়ত্ত ছিল ; তাই, শিশু-মনের অভিব্যক্তিতে প্রায়শঃই পরিণত মানসের প্রকাশ অধিকাংশ রচনাকে অন্য এক জগতের সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়েছে। সে সব যথাস্থানে আলোচ্য।

বর্তমান গ্রন্থটি শিশু-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়, সেরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা রচনায় হাত দিই নি। আলোচনার পরিধি থেকে অনেক গল্প, কাহিনী, নাটক, কবিতাকে বাদ দিতে হ'য়েছে এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনে এদের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

মুহূর্তের প্রয়োজন মিটিয়েই এদের আবেদন নিঃশেষিত। আমরা কবির শিশু-সাহিত্যের আকাশ থেকে এমন কয়েকটি রচনা নির্বাচন করেছি যাদের আবেদন গভীর তাৎপর্যে উজ্জ্বল, অথবা যাদের পশ্চাতে রবীন্দ্রমানসের কোন গোপন চিত্র লুক্কায়িত, অথবা কবির জীবনস্রোতে যারা উল্লেখযোগ্য বন্দর। এই নির্বাচনে আমরা যে আমাদের ব্যক্তিগত রুচির দ্বারা প্রভাবিত হবো, তা একান্তই স্বাভাবিক। সে জন্য আমাদের নির্বাচনের সঙ্গে অন্যের রুচির গরমিল থাকা সম্ভব। সে গরমিলের কথা স্মরণে রেখে নির্বাচিত গ্রন্থ বা কাহিনীগুলিকে সমকালীন রবীন্দ্রজীবনের পটভূমিকায় স্থাপন করে তাদের স্বাদ গ্রহণে চেষ্টা করেছি। তাতে তাঁর জীবনের কোন পর্ব নূতন আলোকে প্রতিভাত হয়েছে। সে আলোক যদি কোন অন্ধকারকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকে তো তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

একমাত্র 'সহজপাঠ' সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য নয়। শিশু-পাঠ্যরূপে রচিত এ গ্রন্থটিকে আমরা আধুনিক কালের শিশু-মনস্তত্ত্বের আলোকে বিচার করেছি ; এবং তাতে আমাদের দৃষ্টিতে গ্রন্থটির যে সব ত্রুটি ধরা পড়েছে, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমাদের আলোচনা যদি কোথায়ও কোথায়ও কঠোর হ'য়ে থাকে তো তাকে সত্য-সন্ধানের উদার মনোভাব নিয়েই গ্রহণ করতে হবে। নতুবা আমাদের প্রতি অবিচার করা হবে।

পরিশেষে, বহুদিন পূর্বেই গ্রন্থটির প্রকাশ বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। কিন্তু নানা অসুবিধায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সে জন্য প্রকাশকগণ যেমন, তেমনি আমরাও আন্তরিক দুঃখিত।

কলিকাতা
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

অরবিন্দ পোদ্দার
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

অরবিন্দ পোদ্দার ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

———

'কথা ও কাহিনী'

॥ এক ॥

শিশু ও কিশোর মনের প্রতিফলনে রবীন্দ্রসাহিত্যের রূপ, সাফল্য ও অসাফল্য উভয় উত্তরাধিকারের মাধ্যমেই, নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। কখনো কোন এক বিশেষ প্রচেষ্টায় কবিকে আমরা হয়তো উদয়রবির সমস্ত মাধুর্য ও দিব্যালোকে প্রতিফলিত দেখি না এবং তৎকালীন অস্বস্তি ও সাময়িক অতৃপ্তিই আমাদের প্রতিক্ষার কৃপণ প্রাপ্তি ব'লে অনুভূত হয়। অন্যত্র, কিশোর সাহিত্যের আরেক পটভূমিকায় আমাদের প্রত্যয় হয়, রবিরশ্মি সেই অপরূপ রূপ ও রসের ফসল ফলাতে সক্ষম যার আস্বাদনে অপরিণত কিশোরের মন অবচেতনার সমস্ত কুয়াশা ও অন্ধকার পার হয়ে এক গভীর চেতনার অমরত্ব লাভ করে। সাফল্য ও অসাফল্য এই দুই বিপরীত লাভ-ক্ষতির আলোছায়ায় আবছা এক বিরাট কবিমূর্তি আংশিকভাবে আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনায় বিভ্রান্তিজনিত অতিশয়োক্তির কারণ ঘটে।

আমাদের বর্তমান আলোচনা 'কথা ও কাহিনী'-র কবিতাগুচ্ছকে নিয়ে সীমিত; এবং বিচ্ছিন্ন এই একটিমাত্র প্রবন্ধের যাই মন্তব্য থাক, অনিবার্য কারণেই তা অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্র-রচনাবলীর একক বা অবিচ্ছিন্ন রূপ, যা কেবলমাত্র সমগ্র কাব্যবিচারেই অনুভূত হতে পারে, কখনো তার সমস্ত তথ্য নিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট আলোচনায় বিকীর্ণ হতে পারে না; কেননা, 'কথা ও কাহিনী' রবীন্দ্রনাথের কবিকর্মের কোন দর্পণ নয়। অন্যান্য রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে এই বইয়ের জাতি বা গোত্র সম্পূর্ণ পৃথক; এবং শুধুই রবীন্দ্রনাথের নয়, পৃথিবীর যে কোন কবির যে কোন কাব্যপুস্তক থেকে 'কথা ও কাহিনী' স্বতন্ত্র। রবীন্দ্র-জীবনীর একটি বিশেষ সময়ের বিশেষতর কোন চেতনার গভীরে অবতরণ করলেই এ বইয়ের আত্মিক রূপটিকে স্পর্শ করা সম্ভব হয়। কবির

যৌবনকালের রাজনৈতিক অনুভব ও দর্শন এই অবতরণে যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি কিশোর মনে এ বইয়ের অনুশীলন কোন্ মানবিক স্বাক্ষর রেখে যায় তা অনুধাবন করতে আমাদের সাহায্য করে। আপাততঃ অনুরূপ গভীরে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা 'কথা ও কাহিনী'-র আলোচনা সুরু করব।

॥ দুই ॥

প্রশ্ন উঠতে পারে, কিশোর সাহিত্যের সীমাবদ্ধ আলোচনায় এ বইটির অবতারণা আদৌ সঙ্গত কিনা। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুকে যিনি তখন শিশু বা কিশোর ছিলেন না। সমস্ত বইটি যত্ন নিয়ে পড়লে আরো অনুভব করা যায়, কয়েকটি কবিতা কিশোর মনের সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়। তথাপি কিশোর সাহিত্যের পটভূমিকায় 'কথা ও কাহিনী'-র বিস্তৃত আলোচনার সঙ্গত কারণ আছে, আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে বইটিকে কিশোর পাঠ্য বলে মনে করতেন তারও প্রমাণ রয়েছে। *

'কথা ও কাহিনী'-র কবিতাগুচ্ছ যে কিশোর মনকে উপস্থিত লক্ষ্য রেখে রচিত বা প্রকাশিত হয়েছে, এমন কথা আমরাও বলি না। অন্য এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে সংকলনের অধিকাংশ কবিতা রচনা ক'রেছিলেন। কি কারণে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও গাথা পুস্তকগুলি ঘেঁটে

---

*'একজন প্রবীন বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা পড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন, বলেছিলেন, এ তো ছেলেমেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়। এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি বা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আবরু নষ্ট হল। নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল।'...

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা, ১৩৩০)

বিপরীত সমালোচনার উপরোক্ত প্রতিক্রিয়া 'কথা ও কাহিনী'-র প্রথম কবিতা 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' সম্পর্কে।

একই সময়ে এক ধরনের কয়েকটি কবিতা তিনি রচনা ক'রলেন, আর আশী বছরের দীর্ঘায়ু জীবনে তার পুনরাবৃত্তি ক'রলেন না, তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের জীবনী পাঠ করলেই উপলব্ধি করা যায়। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের রবীন্দ্র-জীবনী পাঠে আমরা জানতে পারি, এ-সময় রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে স্বদেশীয় রাজনৈতিক নেতাদের ভিক্ষুকসুলভ মনোবৃত্তি এবং বিদেশীয় শাসকগোষ্ঠীর উদ্ধত মনোভঙ্গির সমালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, এবং এই বৎসরেই ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় দু'টি ঘটনার সূত্রপাত হয়।

১৩০৫ বঙ্গাব্দের দু'টি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনাকে গভীরভাবে স্পর্শ ক'রেছিল, ঘটে মারাঠায় এবং বাংলা দেশে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই ঘটনা দু'টির প্রভাব সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী হ'লেও গুরুত্বের দিক থেকে দু'টিই সমান স্মরণীয়। এদের একটি হ'লো, রাজনৈতিক কারণে তিলকের কারাদণ্ড,* এবং দ্বিতীয়টি হ'লো লর্ড কার্জনের বঙ্গে আগমন। দেশের স্পর্শকাতর পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল কবি-মানসের উপর প্রথম ঘটনাটির যে প্রতিক্রিয়া হয় তারই পরিণত ফসল কবিগুরুর এই সময়কার 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধ রচনার ভূমিকা

---

* "র‍্যান্ড হত্যার জন্য গবর্ণমেন্ট টিলককে পরোক্ষভাবে দায়ী করিলেন ; দীর্ঘকাল মোকর্দ্দমা চলিয়াছিল ; অবশেষে টিলকের দেড় বৎসরের জন্য জেল হইল। রাজনৈতিক অপরাধের জন্য কারাবরণ জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রথম ; সুতরাং সমস্ত দেশময় এই ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল, তাহা গবর্মেণ্ট যাহা চাহিয়াছিলেন, ঠিক তাহার বিপরীত। গবর্মেণ্ট জেলের ভয় দেখাইয়া যাহা নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল ; লোকের জেলের ভয় ভাঙিয়া গেল। অচিরে এই দমননীতির প্রতিক্রিয়া দেশমধ্যে নানা ভাবে, নানা মূর্তিতে দেখা দিল ; সেটি হইতেছে জাতীয় আন্দোলনের রুদ্রপন্থা।

"টিলকের প্রতি সহানুভূতি সর্বত্রই প্রকাশিত হইল ; বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র মল্লিক ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত টিলকের মোকদ্দমার সাহায্যকল্পে জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া পুণায় পাঠাইয়াছিলেন।"

—রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড ৩৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা।

সম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ভারতবর্ষের এই উদ্যত জাতীয়তাবোধ টিলকের কারাগারে মুখর হইয়া উঠিল ; সুতরাং গবর্মেণ্ট যে কণ্ঠ হইতে কেবল আবেদন ও ক্রন্দন শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাহা হইতে স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ প্রচারিত হইতে দেখিয়া অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন ; সেই কণ্ঠকে রোধ করার জন্য সিডিশন বিলের খসড়া প্রস্তুত হইল, গোপনে প্রেস কমিটি বসিল। সিডিশন বিল পাশ হইবার পূর্ব্বদিন টাউন হলের জনসভায় রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ আরম্ভ করিলেন এই বলিয়া : 'অদ্য আমি যে ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা যদিও বাঙালীর ভাষা, বিজিত জাতির ভাষা, তথাপি সে-ভাষাকে আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভয় করিয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, এ ভাষা তাহারা জানেন না এবং যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার সেখানেই অন্ধ আশঙ্কার প্রেতভূমি।' (রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)। টিলকের কারাদণ্ড এবং তৎপরবর্তী সিডিসন বিল-এর প্রতিক্রিয়া কবিচিত্তকে সে দিন কী পরিমাণ বিচলিত করেছিল, উপরোক্ত বক্রোক্তি এবং টিলকের জন্য কবির অর্থ সংগ্রহ-ই তার প্রমাণ। এ সময়কার কবি রচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি সর্বত্র বিদেশী শাসকের পাশবিক-শক্তিগরিমার তীব্র প্রতিবাদে ভাস্বর, এবং এক নির্ভয় কবিচরিত্রের বীর্যবন্ত প্রকাশ। লর্ড কার্জনের বঙ্গে আগমন কিন্তু এই নির্ভীক কবিমনকেই সম্পূর্ণ সঙ্গত কারণে শংকিত করে তোলে। বাংলাভাষার প্রতি কূটবুদ্ধি ইংরেজ সরকারের পরোক্ষ বৈরিতা কার্জনের আগমনের আগে থেকেই নানা ঘটনায় স্পষ্ট হচ্ছিল ; কার্জনের আমলে এই সঙ্গে আরো সুরু হ'ল বঙ্গ-বিভাগ-এর ষড়যন্ত্র।* এই ষড়যন্ত্রের প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ সজাগ ছিলেন,

*"উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বাংলা দেশে ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছিল। তাহাকে ব্যর্থ করিবার বিবিধ প্রকাশ্য গোপন চেষ্টা যে গবর্মেণ্ট করিতেছিলেন, জাতীয় ইতিহাসের পাঠকের তাহা অবিদিত নহে। সাধনায় রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে যে সব প্রবন্ধ লেখেন তাহার কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৩০৫ পৌষ মাসে লর্ড কার্জন বড়লাট হইয়া আসিবার পর হইতে বাংলার জাতীয়তাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য বিধিবদ্ধ চেষ্টা সুরু হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গচ্ছেদ হইল।"—রবীন্দ্র-জীবনী, ৩৫০ পৃঃ।

এবং কিভাবে এই দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা থেকে মুক্ত হওয়া যায় সে সম্পর্কে তাঁর মনে একটা বদ্ধমূল ধারণাও নিশ্চয় এ সময় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই সংকল্পের কথা তখন গদ্য প্রবন্ধ মারফৎ ঘোষণা করা কবির পক্ষে সহজ বা সম্ভব ছিল না; কেন না, সিডিসন বিল-এর প্রচণ্ড বাধা। এই কারণেই হয়তো কবির চেতনায় যে রাজনীতি তখন প্রজ্বলিত হয়েছিল তার কোন স্পষ্ট অভিব্যক্তিই তাঁর এসময়কার প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যায় না।*

'রবীন্দ্র-জীবনী'তে এই সময়টিকে কবির সৃষ্টিকর্মের দিক থেকে নিষ্ফল যুগ বলা হয়েছে। আমাদের তা মনে হয় না। 'কথা'-র জন্মের আগে যে সময় কবিগুরু প্রায় সাহিত্যিক মৌন অবলম্বন করেছিলেন, তা প্রতীক্ষার, জন্মদানের পূর্ব-মুহূর্তগুলির অস্বস্তিকর নীরবতার যুগ।

১৩০৬ বঙ্গাব্দে কবি 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব ত্যাগ করলেন এবং তার রাজনৈতিক প্রবন্ধ, সাহিত্য আলোচনা প্রভৃতি সকল গদ্য রচনাই কিছুদিনের মত স্তব্ধ রইল। পারিবারিক কারণ অথবা সাহিত্যিক অসংখ্য কাজ-ই † কি তার হেতু, অথবা যে কথাটি গদ্যে বলা তৎকালীন রাজনৈতিক বিদ্রোহঘোষণারই সামিল, সেই কথাটি কবিতার মাধ্যমে পরিবেশন করার মানসিক তাগিদই এই স্তব্ধতার কারণ, সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনাই এখানে আমাদের কাম্য।

'রবীন্দ্র-জীবনী'র গভীরে প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাই কিছুদিন এমন

---

* সিডিসন বিল-এর ফলে প্রবন্ধ সাহিত্য মারফৎ রাজনৈতিক মতামতের নির্ভীক প্রকাশ এ-সময় অসম্ভব ছিল। এ-সময়কার রবীন্দ্র মানসের যে ছবিটি আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়, তা হলো এক অগ্নিগর্ভ চেতনার সংহত অবস্থা। এই অবস্থাকে প্রবন্ধে প্রকাশ করার একটিমাত্র ফলাফলই তখন সম্ভব ছিল, বিরুদ্ধ রাজশক্তির ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আহুতি হওয়া। রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন দেশকে স্বাধিকারের প্রস্তুতিতে দীক্ষা দেওয়াই বড় ছিল। তাই সোজাসুজি রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে না গিয়ে এ-সময় তিনি অন্য (সাহিত্যের) পথ অবলম্বন করেছেন। এই পথের নির্দেশ দেয় 'কথা ও কাহিনী।'

† রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫ দ্রষ্টব্য।

কি কাব্য রচনায়ও মনোনিবেশ করা কবির পক্ষে কঠিন ছিল। নিবিষ্ট চিন্তায় মনের অন্তস্থলে প্রবেশ করার উপায় ছিল না। মানসপটের উপরাংশের ভাসা-ভাসা চেতনা ও উপলব্ধি নিয়ে আসে টুক্‌রো টুক্‌রো কবিতা; কণিকার চার লাইনের, ছয় লাইনের কবিতাগুলি। এর কারণ, 'রবীন্দ্র-জীবনী' রচয়িতার ব্যাখ্যায় কবির মনে সুমহৎ চিন্তার বিরুদ্ধ পরিবেশ * আমাদের মতে কারণটি একেবারেই বিপরীত। চেতনার গভীরে এক সুমহৎ চিন্তার তোলপাড়-এর পূর্বাভাসই হলো এই মৌন, এবং কণিকার খসড়া কবিতাগুলি। অতঃপর 'কথা' প্রকাশিত হল, তার মাধ্যমে কবির তৎকালীন মানসিক যন্ত্রণা ও রাজনৈতিক দর্শন এই প্রথম নির্ভয় মুক্তির আস্বাদ পেল। যার প্রকাশের সম্ভাবনায় কবি কিছুকাল প্রায় নির্বাক ছিলেন, সেই কবিতার জন্ম হল। † যে রবীন্দ্র-জীবনীকার এ সময় রবীন্দ্র মানসে সুমহৎ চিন্তা ও সুবৃহৎ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতিকূল অবস্থা অনুমান করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তিনিই এই নবজন্ম সম্পর্কে ঘোষণা করলেন: 'কথা' কাব্যগ্রন্থ বাংলা দেশে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করিতে কী পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে, তাহা বাঙালী পাঠকমাত্র অবগত আছেন।"...আমাদের সুস্পষ্ট বিশ্বাস, এই জাতীয়তাবোধের গভীরতাকে প্রকাশের অন্তরপ্রেরণাই রবীন্দ্রনাথকে ইতিপূর্বে ধ্যানমগ্ন নীরবতায় কিছুকাল

---

*রবীন্দ্র-জীবনীকার-এর মতে এসময়কার কবির অবস্থা "সুমহৎ চিন্তা, সুবৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য অবসরের প্রয়োজন। সে অবসর নাই, মনেও শান্তি নাই; তাই অবসর সময়ে লিখিতেন 'কণিকা'-র কবিতা।...বৎসরের মাঝামাঝি হইতে যে কাব্যলক্ষ্মীর সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল তিনি মানসসুন্দরী নহেন, তিনি সুবচনী কথালক্ষ্মী। অন্তর্বিষয়ী কাব্যের প্রেরণা আজ ম্লান, তাই আজ বহির্বিষয়ী বস্তু বর্ণনায় গল্প বা কাহিনী রচনায় মন যাইতেছে।..."

—রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড. ৩৬০ পৃঃ।

† 'কথা ও কাহিনী'-র পূর্বনাম 'কথা।'.. "তিনি বৌদ্ধ সাহিত্য, বৈষ্ণব গ্রন্থ, রাজপুত, শিখ ও মারাঠাদের কাহিনী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্তগুলি অবলম্বনে 'কথা' গুলি রচনা করিলেন।'

—রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৩৬০ পৃঃ।

স্থির রেখেছিল, এবং সারাজীবন (জীবনের শেষ অধ্যায়টিকে বাদ দিলে) যে চঞ্চলতার মাত্রাধিক্যে তিনি প্রায় কিশোরের মতই গভীর থেকে অগভীরে যাতায়াত করে গেছেন, জীবনের এই কয়েক মাস ধ্যানমগ্ন কবি তাঁর কবিতা রচনার সেই চঞ্চল স্বভাবটি পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিলেন।

॥ তিন ॥

উপরোক্ত ঐতিহাসিক পটভূমি এবং পটভূমি-সম্পৃক্ত কবির মানসজীবনের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তা স্মরণে রেখে এবার 'কথা ও কাহিনী'-র প্রকাশকে কেন আমরা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা বলে ঘোষণা করি এবং কেনই বা এ বইয়ের অন্তর্নিহিত বাণীটিকে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন রাজনৈতিক দর্শন বলে মনে করি তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। আমাদের সুস্পষ্ট বিশ্বাস, ১৩০৫—০৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই সশস্ত্র অভ্যুত্থান-এর পথে ভারত-মুক্তির কামনা করেছিলেন, তার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার জন্য যে প্রস্তুতি, আত্মোৎসর্গ এবং বীর্যবত্তার প্রয়োজন, 'কথা ও কাহিনী' তারই বেদমন্ত্র অথবা চারণ-সংগীত। তিলকের গীতাভাষ্যের মতই তৎকালীন বাঙালীদের এই রাজনৈতিক 'গীতা' তাই শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক অর্থেই এক বিরাট বিস্ফোরকের ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছে; স্বদেশী আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত চরমপন্থা অবলম্বনের জন্যও যুবশক্তিকে আহ্বান জানিয়েছে।

রাজনীতির চরম পথটিই যদি এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাম্য না হ'তো তা হ'লে 'কথা ও কাহিনী'-র উৎসও কখনো বিশেষ করে মারাঠী, শিখ এবং রাজপুত কাহিনীতেই স্থির থাকতো না। এই তিনটি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তিতে এক—বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠীকে স্বরাজ্য থেকে (অথবা স্বদেশ থেকে) আমূল উৎপাটন করা। এই স্বপ্ন নিয়ে আজীবন সংগ্রাম করেছেন শিবাজী, গুরুগোবিন্দ এবং কোন কোন রাজপুত পুরুষ এবং

রমণীরাও। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে একদিকে ভারতের প্রাণ-শক্তিকে জেগে উঠতে দেখে এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হীন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থেকেও রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ রাজনীতির আলোচনায় মৌন হলেন ; কিন্তু এই সময়েই তিনি 'কথা ও কাহিনী' লিখলেন, যার অধিকাংশ কবিতাই সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্জাত। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এর হেতু কি ? বৃটিশ রাজত্বের প্রথম অধ্যায়ের ভারতীয় ইতিহাস থেকেই কবি তাঁর কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করলেন। শিবাজী তাঁর ধ্যানের আদর্শ হলো, তাঁর চিন্তাকে দিলো দুঃসাহসের দুর্বারতা। তিনি 'শিবাজী-উৎসব'-এর আয়োজনকে কবিতা দিয়ে সমর্থন জানালেন, কিন্তু উৎসবের অনতিবিলম্বেই তিলকের কারাদণ্ড হলো এবং ঐ কারাদণ্ডকে কেন্দ্র করেই ভারতের রাজনীতি চরম পথে পদক্ষেপ করল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তৎকালীন অভ্যাস,—অর্থাৎ প্রবন্ধের মাধ্যমে রাজনীতিক তত্ত্বালোচনা বিস্মৃত হলেন ; কিন্তু রাজস্থানের স্বাধীনতা সংগ্রাম হলো তাঁর কাব্যসাধনার প্রধান অবলম্বন, তাঁর ধ্যানগম্ভীর আদর্শ মৃত্যুঞ্জয়ীদের শৌর্যবীর্য ত্যাগে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ! কিন্তু কেন ?

এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর সম্ভব তা হ'লো, এ-সময় গদ্য-সাহিত্যের মারফত তিনি যা বলতে পারছিলেন না এবং সোজাসুজি যে-কথা লেখা স্পষ্টই এ সময় আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল, সেই বৃটিশ-বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণাই 'কথা ও কাহিনী'-র ভাবসম্পদ, তার প্রাণ। পূর্ণ স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা এ গ্রন্থের কয়েকটি কবিতাতেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট, সেই আকাঙ্ক্ষা তো কবিকে বাদ দিয়ে তাঁর আত্মজিজ্ঞাসাকে বাদ দিয়ে শুধু কবিতার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। ঐ চরম আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কোন রাজনীতি এ-সময় কবির মনে ছিল না, যদি থাকতো তা'হলে প্রবন্ধাকারে তার মুদ্রনে বাধা ছিল না। এই কারণেই ১৩০৫-এর ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের হাতিয়ার পাল্টালেন—'কথা ও কাহিনী'ই হলো ১৩০৬ বঙ্গাব্দে কবিগুরুর অখণ্ড রাজনৈতিক মতামত। গদ্যে যে-কথা বলা

সম্ভব না, ছন্দে তিনি তাই প্রকাশ করলেন। সদ্য জাগ্রত বাঙালী কিশোর এবং যুবকেরা তার মর্ম তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করল এবং ১৩০৬ বঙ্গাব্দেই, যখন ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্পটিও স্বদেশীয় রাজনীতিতে সম্পূর্ণ বর্জিত ছিল, তারা এই একটি কাব্যগ্রন্থকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করল, ভালবাসল।*

পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রমানসে এখনই যে প্রথম অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়েছিল, তা নয়। বাল্যকালে রাজনারায়ণ বসুর সান্নিধ্য ও হিন্দু-মেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কবির স্বাজাত্য ও স্বাধীকারবোধকে সম্পূর্ণই উদ্দীপ্ত ক'রেছিল। স্বাধিকার অর্জনের প্রেরণায় এসময় রাজনারায়ণ বসু, জ্যোতিরীন্দ্র-নাথ ঠাকুর প্রভৃতির যে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'তো সেখানে রবীন্দ্রনাথের যোগদানের অধিকার ছিল। † পরাধীনতার যন্ত্রণা তেরো বৎসরের বালককে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, তার উদাহরণস্বরূপ সেদিনের হিন্দুমেলায় পঠিত তাঁর স্বরচিত গান-এর একটি পংক্তি নীচে তুলে দিচ্ছি:

…আমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন
প্রকৃতি শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।…

যত্নের সঙ্গে উপরোক্ত কবিতাংশটিকে বিশ্লেষণ ক'রলে আমরা স্পষ্টই অনুভব ক'রব, রবীন্দ্রনাথ জ্ঞাতসারে অথবা তাঁর অবচেতন মনের গভীরতায় সেদিনই ক্রান্তিলগ্নের ভৈরব রূপকে হৃদয়ে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পরিবেশের পরিবর্তনে অবশ্য এই মনোভাবের বিস্ফোরণ আর সম্ভব ছিল না। রাজনীতি নয়, কবিতার সাধনাই ধীরে ধীরে তাঁকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল। সুতরাং রুদ্রের স্তবমুখর দিনরাত্রির একটিই চেতনা, যা তিলকের মত রাজনৈতিক নেতাদের রক্তের সঙ্গে দ্রুত একাকার হয়েছিল,

* রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† জীবনস্মৃতি: রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনকে যদিও স্পর্শ করেছিল, গ্রাস করেনি। কিন্তু যে ধর্ম একবার চেতনায় গভীর হয়, তা জীবনের নানা রূপান্তরেও সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে যায় না; তার মন্ত্র কবির, বৈজ্ঞানিকের, দার্শনিকের জীবনজিজ্ঞাসায় মাঝে মাঝেই গুঞ্জরিত হয়, এবং সময় পেলেই মাথা তোলে। *

'কথা ও কাহিনী' সেই মানবধর্মের, স্বাধিকার চেতনার, যৌবশক্তির পুনর্জাগরণ।

॥ চার ॥

'কথা ও কাহিনী'-র গভীরে প্রবেশ করলে আমরা যে ক'টি কাহিনীর চেতনায় প্রবেশ করি, দু'টিমাত্র কবিতা বাদ দিলে, তাদের একটিই হৃৎস্পন্দন—মানবধর্মের আনুগত্যে পরিপূর্ণ আত্মাহুতি। বইটির প্রথম মুদ্রনের † দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলে একথা আরো স্পষ্ট হবে। এই সংকলনে আমরা নিম্নলেখ কবিতাগুচ্ছকে পাই:

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা	নগরলক্ষ্মী	শেষ শিক্ষা
প্রতিনিধি	অপমান-বর	নকল গড়
মস্তক বিক্রয়	স্বামীলাভ	হোরিখেলা
পূজারিণী	স্পর্শমণি	বিবাহ
অভিসার	বন্দী বীর	বিচারক
পরিশোধ	মানী	পণরক্ষা
সামান্য ক্ষতি	প্রার্থনাতীত দান	দেবতার গ্রাস
মূল্যপ্রাপ্তি	রাজবিচার	বিসর্জ্জন

* মানবতা ও স্বাদেশিকতার বোধ কবিমাত্রেরই আত্মিক অনুভব। মাইকেল-এর মত প্রচণ্ড বিলিতিনবীশেরাও তাই 'নীলদর্পণ'-এর মত প্রচণ্ড রাজনৈতিক কথাসাহিত্যের সঙ্গে সময়ে একাকার হন।

† 'কথা'', ১৩০৬।

দু'টি মাত্র কবিতা, 'দেবতার গ্রাস' ও 'বিসর্জ্জন'-কে বাদ দিলে আমরা বুঝতে পারি, কবিতাগুলির উৎস ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ। ইতিহাস আমাদের জানায় স্বাধিকার চেতনা ও স্বাজাত্যবোধ এবং ধর্মগ্রন্থের কাহিনীগুলি টেনে নেয় গভীর মানবতাবোধ ও নিষ্কাম আত্মদানে। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের রবীন্দ্রমানস এই মানবতাবোধ ও নিষ্কাম আত্মদানের সঙ্গে সামাজিক মানুষের সাধারণ রাজনীতিকে একাকার ক'রেছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। তার উল্লেখ পূর্ব অধ্যায়ে করেছি। দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের প্রস্তুতিহীন রাজনীতির পাশাখেলায় কবির চিরদিনই সেই বীতরাগ ছিল যা প্রায় অশ্রদ্ধার সমান। ১৩০৫-০৬ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল এক ক্রান্তিলগ্নের আবির্ভাব হিসেবে, কিন্তু লগ্নকে সার্থক করতে হ'লে তার প্রস্তুতি চাই, স্বাধীনতা লাভ করার প্রয়োজনে রক্তের আহুতি দেওয়া চাই, নিজেকে নিঃশেষে ফুরিয়ে দিতে জানা চাই। এই প্রস্তুতি, মন ও আত্মিক অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন মহৎপ্রাপ্তিই সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতার মন্ত্রোচ্চারণেও রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্-এর নচিকেতা দর্শনকে স্মরণ করেছেন ; যেখানে আদর্শের জন্য আত্মাহুতি তাঁর দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছে, ভারতীয় ইতিহাসের সেইখানেই তিনি একবার স্থির হয়েছেন, আর সযত্নে আত্মদানের চিত্রটি আহরণ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

প্রার্থনাতীত দান

(শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্মপরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়)

পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
বন্দী শিখের দল—
সুহৃদগঞ্জে রক্তবরণ
হইল ধরণীতল।
নবাব কহিল, "শুন তরু সিং
তোমারে ক্ষমিতে চাই।"

তরু সিং কহে, "মোরে কেন তব
এত অবহেলা ভাই।"
নবাব কহিল, "মহাবীর তুমি,
তোমারে না করি ক্রোধ ;
বেণীটি কাটিয়া দিয়ে যাও মোরে
এই শুধু অনুরোধ।"
তরু সিং কহে, "করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছ তার বেশী কিছু দিব,
বেণীর সঙ্গে মাথা।'

রবীন্দ্রনাথের কবিতার নায়ক সাধারণতঃই কোন রাজা-মহারাজা নন, ইতিহাস-বিখ্যাত যোদ্ধা বা নেতা নন (গুরুগোবিন্দ ও শিবাজী ব্যতিক্রম—তাঁদের আদর্শের গভীরতাই তাঁদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিল, এ-ও ভাববার কথা।) ইতিহাসের ভীড়ের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ। কিন্তু এই মানব মিছিল কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্ধ জনতা বা 'ক্রাউড' নয়, তাঁরা সবাই আদর্শবাদী সাধক, দুর্জয় আত্মিক বলে চরিত্রবান। এঁরা কেউ লুব্ধ নন, লালসায় অস্থিরচিত্ত নন, অল্প দিয়ে বেশী পাওয়ার মন নেই এঁদের ; সমস্ত দিয়ে সত্যকে পাওয়াতেই এঁদের একান্ত সাধনা। কুম্ভ, শ্রীমতী, তরু সিং, উপগুপ্ত, সুপ্রিয়া—এঁরা সবাই ইতিহাসের, কিন্তু ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক এঁদের কথা লেখে না ; কেননা এঁদের আত্মদান এমনই গভীরে যেখানে ইতিহাসের কেনা-বেচা হট্টগোলের চীৎকার পৌঁছে না। কিন্তু ইতিহাস এঁরাই সৃষ্টি করেন, রাজনৈতিক ইতিহাস এঁদেরই সান্নিধ্যে রূপান্তরিত হয় মানবিক ইতিহাসে। ১৩০৫-০৬ বঙ্গাব্দের প্রজ্বলিত রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার কামনা থেকেই আরও অনুভব করেছিলেন, মানবতার পরশমণি সঙ্গে না থাকলে স্বাধীনতাও অর্থহীন ; প্রস্তুতিহীন

আন্দোলন তেমনি পণ্ডশ্রম। তাই রাজস্থানের প্রাণদানের ইতিহাসের সঙ্গে কবির, শ্রীমতী, সুপ্রিয়া-র কাহিনী এসে মিশেছে। তাই '[illegible]গড়' 'নকল-গড়,' 'হোরি খেলা'-র মত কবিতার সঙ্গে রাখীবন্ধন ঘটেছে 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা,' 'অভিসার', 'নগর লক্ষ্মী'-র মত কবিতাগুচ্ছের। শুধু জলে যাওয়ার আহ্বানই যদি রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-র অনুভব হ'তো তা'হলে তার তুলনা বাংলা সাহিত্যেও একাধিক মিলত। রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালেই নজরুল এমনিতর অসংখ্য চারণ-কবিতার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু 'বিদ্রোহী', 'বিশের বাঁশী' প্রভৃতি কবিতার বই আভ্যন্তরীণ আগ্নেয় অনুভবেই পরিসমাপ্ত ; 'কথা ও কাহিনী'-র গতি গভীর থেকে গভীরতম যাত্রায়, তার অনুভব মানবীয় স্বপ্ন ও যন্ত্রনার রক্তের সঙ্গে এক। তাই তিনি শিবাজীর মুঘল-বিরোধী আমরণ সংগ্রামকে শুধু স্বাধীনতার সংগ্রামেই শেষ বলে মনে করেন না, সেখানে আরেক ত্যাগের আদর্শ তাঁর চোখে পড়ে :

…অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি
ভিক্ষা-অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে,
প্রসাদ পাইল শিষ্য তাঁরি।
রাজা তবে কহে হাসি, "নৃপতির গর্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক ;
প্রস্তুত রয়েছে দাস, আরো কিবা অভিলাষ,
গুরু-কাছে লব গুরু দুখ।"
গুরু কহে, "তবে শোন্ করিলি কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার—
এই আমি দিনু কয়ে, মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহ পুনর্বার।

তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

"বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্বাদ-সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস ;
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো"
কহিলেন গুরু রামদাস।
নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখাল-বেণু, গোঠে ফিরে গেল ধেনু,
পরপারে সূর্য গেল পাটে।...

এই আদর্শের জন্য মানুষকে অনেক কিছুই মূল্যস্বরূপ দিতে হয় ; তার ঐশ্বর্য, আরাম, লোভ আর বিলাস। সংসারের সীমায় দৈনন্দিন প্রয়োজনের গরজে আবদ্ধ মানুষের পক্ষে এ ত্যাগ সহজ নয়। তার জন্য অন্যতর আদর্শে অন্য দীক্ষায় দীক্ষিত হতে হয়। দিনের পর দিন, ছবির পর ছবি চোখের সামনে অন্য অনুভব ও উপভোগের হাতছানি আনে ; সহ্য করতে হয়, মহৎ কামনা ছাড়া অন্য সমস্ত পার্থিব কামনা থেকেই নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে হয়—তবেই কর্মী, নেতা, যোদ্ধা হওয়া সম্ভব। পার্থিব উপভোগের লগ্নে উপগুপ্ত তাই প্রকৃত সন্ন্যাসীর মতই নিজেকে কঠিনে আবৃত করে ; নেতৃত্বের শিখরে আরোহন করেও গুরুগোবিন্দ তাঁর অধৈর্যের প্রায়শ্চিত্ত করেন আততায়ীর হাতে আত্ম-বিসর্জন দিয়ে, শিবাজী সন্ধ্যার অন্ধকারে চিন্তা ও চেতনার সঙ্গে এক হন। রক্তের বদলে যে স্বাধীনতা অর্জন তার জন্য কবি উপনিষদের তত্ত্বকে নতুনতর অর্থে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। নচিকেতার স্বপ্নকেই

তিনি রাজনীতির আশ্রয় বলে মনে করেছিলেন। তাঁর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বানে সর্ত আরোপিত ছিল—সেই সর্তটি হ'লো : নিজের আত্মাকে জাগাও ; কী তুমি চাও, কী তোমার লক্ষ্য তা জান, আত্মজ্ঞানে বলিষ্ঠ হও, তারপর সৈনিক হও।

এই দর্শনের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যদি আমরা আধুনিক কাব্যসাহিত্যে তার তুলনা খুঁজি, তা'হলে একমাত্র ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর কিছু কবিতা ছাড়া আর কোথাও আমরা সেই তুলনার স্পষ্ট ছবি দেখি না। স্বাধিকার চেতনায় প্রমত্ত শেলী বা পুস্কিন, অথবা মানবীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হুইট্‌ম্যানের কবিতায় আমরা জীবনের মহৎ আদর্শের সন্ধান পাই, কিন্তু তাঁদের কবিতায় প্রমিথিয়ূসের মন কাজ ক'রলেও তার সঙ্গে নচিকেতা-অনুভবের কোন মিল নেই। কিন্তু ব্রাউনিং বিস্ময়করভাবে একই অনুভবের সন্নিহিত হ'য়েছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের বহুপূর্বেই। *তাঁর একটি কবিতার আংশিক উদ্ধৃতি দিলে সম্ভবত: আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে :

PROSPICE

Fear death ?—to feel the fog in my throat,
The mist in my face,
When the snows begin, and the blasts denote
I am nearing the place,
The power of the night, the press of the storm,
The post of foe ;

---

* Robert Browning এর (1) Incident of a French Camp ও (2) How they Brought The good News From Ghent to Aix, কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

Where he stands, the Arch Fear in a visible form,
Yet the strong man must go :
For the journey is done and the summit attained,
and the barriers fall,
Though a battle's to fight ere the guerden be gained,
The reward of it all....

রবার্ট ব্রাউনিং-এর রাজনৈতিক মানস অত্যন্ত স্বার্থকভাবেই তাঁর একাধিক কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে, এবং সে সব কালজয়ী কবিতা রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ পার হয়ে আজো আমাদের মনে সমান তোলপাড় আনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনুরূপ কবিতার সংখ্যা ব্রাউনিং-এর রচনাতেও অত্যল্প। রবীন্দ্রনাথের মত বিশেষ একটি ঐতিহাসিক সময়ে রাজনৈতিক কারণে ব্রাউনিং কবিতা লেখেন নি। 'কথা ও কাহিনী'-র মত উদ্দেশ্যমূলক কবিতার গ্রন্থ তাঁর নেই। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ একক, এবং 'কথা ও কাহিনী' তার অখণ্ড নির্জনের কোলাহল নিয়ে বিশেষ।

'কথা'-র পরবর্তী সংস্করণে* দেখতে পাই কয়েকটি কবিতার সংযোজন ঘটেছে। এই সংযোজনের অন্যান্য তাৎপর্য কি জানিনে, কিন্তু পরবর্তী সংকলনে একটি কবিতার সংযোজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই কবিতাটি হলো 'গুরু গোবিন্দ'। এক যুগ আগের লেখা এই কবিতাটি 'কথায়' প্রকাশিত হয় নি; পরবর্তিকালে 'মানসী' থেকে 'কথা ও 'কাহিনী'তে স্থানান্তরিত হ'য়েছে। কবিতাটির মূল বক্তব্য: আঘাত করার সময় যখন সুদূরে, তখন প্রতীক্ষাই সৈনিকের কর্তব্য। ১৯০৬-এর সংকলনে কেনই বা এই কবিতার স্থান হলো না, পরবর্তি সংকলনে কোন বিশেষ প্রয়োজনেই বা তাকে 'কথা'-য় নিয়ে আসতে হ'লো, চিন্তা করা কর্তব্য। আমাদের একমাত্র অনুমান করা ছাড়া এক্ষেত্রে যখন গত্যন্তর নেই, তখন সেই অস্পষ্ট ধারণা থেকেই মনে হয়,

---

*মোহিত সেন সম্পাদিত 'কথা ও কাহিনী'।

ইতিমধ্যে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, যে ক্রান্তিলগ্ন আসন্ন বলে তিনি অনুভব করেছিলেন, তা এখনো অনেক দূরে। তাই তিনি সংগ্রামের আহ্বানে প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষার সুরটিকে এবার উঁচুতানে বেঁধে দিলেন যাতে সুরটিকে স্পষ্ট শোনা যায়। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞান কতটা প্রখর ছিল এবং তিনি ভারতীয় রাজনীতিকে এই সময় কতটা সত্যদৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন, সময়ে এই একটি কবিতার বিস্মরণ ও সময়মত তার আহরণই সে-সম্পর্কে আমাদের চেতনাকে একটি সুস্পষ্ট ধারণার সম্মুখীন করে।

কিশোর চেতনায় 'কথা ও কাহিনী'-র কাজ কি, সে সম্পর্কে অতঃপর কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। ইত্যবসরে বলে রাখা ভাল যে, রবীন্দ্র রচনাবলী (৭ম খণ্ড)-তে অত্যন্ত সংগত কারণেই সম্পাদক 'কথা ও কাহিনী' অধ্যায় থেকে 'জুতা আবিষ্কার' কবিতাটিকে বর্জন করেছেন। এই বেসুরো কবিতাটি 'কথা ও কাহিনী'-তে অত্যন্ত বেমানান।

॥ পাঁচ ॥

কিশোর সাহিত্যের আলোচনায় 'কথা ও কাহিনী'-র গুরুত্ব কোথায়, সে সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করা যাক। এই গ্রন্থের ভাব-সম্পদ, কবির অন্তর-গূঢ় প্রেরণা, ঐতিহাসিক পশ্চাদপট ও ভাবানুষঙ্গ আলোচনায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, আত্মজ্ঞানে ও আত্মত্যাগে উদ্‌বোধিত হওয়া, আত্মশক্তির ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল হওয়া, মৃত্যুর গরল পান করে অমৃত হওয়ার প্রতিই এদের নির্ভুল সংকেত। এই রস-ঘন চৈতন্যের আমরা নামকরণ করেছি নচিকেতা-দর্শন, যা পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে বিকীর্ণ করেছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব নতুন আলোক, এবং দেশের যুবশক্তিকে করেছে সংগ্রামের আত্মাহুতির চেতনায় উদ্বেল। যদি অতীতের দিকে তাকাই, এবং আমাদের

শৈশবস্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করি, তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এই উক্তির সমর্থন মিলবে ; অনুভব করব, কিশোর-চিত্তে এই কাব্যগ্রন্থের এক একটি বিচ্ছিন্ন কবিতার আবেদন কত গভীর, কত চিত্তহারী ! 'নকলগড়', 'প্রতিনিধি', 'পূজারিণী', 'নগরলক্ষ্মী' প্রভৃতি ভাবের ঔদার্যে ও প্রসাদগুণে উজ্বল কবিতাগুলো কিশোর-জীবনের স্বপ্ন ও সাধের সঙ্গে বহুক্ষেত্রেই একাকার হতে পেরেছে, এবং আমাদের চিত্তে দান করেছে নির্ভীক বীর্যবত্তা। কিশোর মন যখন জীবনের স্বপ্ন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার দুই বিপরীত আকর্ষণে আশা-নিরাশা, সাধ ও যন্ত্রনায় যুগপৎ উৎফুল্ল ও রক্তাক্ত হতে থাকে, তখন তার সমগ্র সত্তাকে রঞ্জিত করে দিতে পারে এমন মহৎ আদর্শ, এমন মূল্যবান অভিজ্ঞতা, এমন উদার চিন্তাভাবনা ও মননের প্রয়োজন আত্যন্তিক। তখন তার স্বপ্ন, অধ্যাস, ভবিষ্যতের আকাঙ্খা তার বাস্তব জীবনকে রূপায়িত করতে থাকে,—সে নিজেকে সৃষ্টি করতে থাকে। সেই সৃষ্টি-হতে-থাকা লগ্নে সে বিচিত্র ভাবতরঙ্গে আলোড়িত হয়, বিক্ষুব্ধ হয় ; তখন পথের আহ্বান যেমন তাকে সামনে ডাকে তেমনি বিপথের প্রলোভনও কম নয়। তাই সে যেমন নিঃশেষে নিজেকে বিনষ্ট করতে পারে, তেমনি ডাকের মত ডাক পেলে আত্মাহুতিতেও উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। সেই কালে, কোন মহৎ আদর্শ যদি তাকে ইতিহাসের দেশের কালপ্রবাহের, এক কথায় জীবনের গভীরে টেনে নিয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতের চরম দুর্ভাগ্যের মুহূর্তেও সে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে ; সব গিয়েও তার মানবিক প্রেম অবশিষ্ট থাকে। হৃদয়ের কোন না কোন নিভৃতে একটু উজ্বল আলোক থেকে যায়।

দেশ ও জাতিকে সেই মহিমায় সেই মানবতাবোধে প্রবুদ্ধ করার প্রকৃষ্ট পথ সেই দেশের কিশোর মনকে উদ্বোধিত করা ; প্রেম, ত্যাগ, মানবতা ও সংগ্রামের রসে উজ্জীবিত করা। বাংলা তথা ভারতবর্ষে এই বেদনার আর্তিতে আর কারও চিত্ত ততোটা কেঁদে ওঠেনি, যতটা কেঁদেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'আয়ন্তু সর্বতো স্বাহা'—এই আহ্বান জানানোর দায়িত্ব পালন

করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা ও কাহিনী' কবিতাগুচ্ছের মাধ্যমে। পরাধীন দেশের কিশোর মননে যা-কিছু মহৎ চেতনার প্রতিফলন, সেই দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, বীরত্ব, বৈরাগ্য, আদর্শ সকলই 'কথা ও কাহিনী'-র কবিতায় প্রতিফলিতহ হয়েছে অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে, সরস ভাষায়, প্রদীপ্ত আলোকে। দেশ বর্ত্তমানে স্বাধীন, কিন্তু যে নচিকেতা-আদর্শের আহ্বান একদিন উপনিষদ থেকে রবীন্দ্রনাথ আহরণ করেছিলেন, তার প্রয়োজনীয়তা এদেশে এবং পৃথিবীর সকল দেশেই আজও অম্লান; কেন না মৃত্যুকে অতিক্রম করে যে জিজ্ঞাসা, মানুষকে তার সভ্যতা মনুষ্যত্ব ও অমরত্ব দান করত তারই তো সর্বপ্রথম অধিকার। মানুষ যত তাড়াতাড়ি এ জিজ্ঞাসার মুখোমুখী হয়, ততই জীবন-সাধনার পথে তার পদক্ষেপ হয় সুদৃঢ়, সংশয়হীন। নচিকেতা কিশোর সমাজেরই প্রতিনিধি; তার জিজ্ঞাসা তাই কিশোর মনের জিজ্ঞাসা; ঐ জিজ্ঞাসার উত্তর ইতিহাস, অভিজ্ঞতা ও প্রেমের সম্পদ থেকে আহরণ করে আনবেন তিনি, যিনি বিজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ এই বিজ্ঞের অভিজ্ঞ প্রেমিকের কর্তব্যই পালন করেছেন। 'বন্দীবীর' কবিতার কাহিনীতে তিনি বর্ণনা করেছেন, আত্মদানের অধিকারে বয়সের কোন ভেদাভেদ নেই, কেন না, শিশুমনও যদি তার গুরুর প্রতি (এখানে পিতা) বিশ্বাসে সুস্থির থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে ছুরিকাঘাতে রক্তাক্ত হতে থাকলেও সে নির্ভয় মৃত্যুবরণে সক্ষম হয়। 'The Boy on the Burning Deck' কবিতার নায়কের মত 'বন্দীবীর'-এর শিখ বালকও তাই কিশোর মনে এক অপূর্ব আদর্শের উন্মাদনা সৃষ্টি করে, একটি দীপশিখা চির-কালের জন্য জ্বালিয়ে রেখে যায়। কিশোর কালে আমরা এই সব কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি, এবং আমাদের তৎকালীন মানবীয় ও রাজনৈতিক চেতনা 'কথা ও কাহিনী'-র মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ, আলোকিত হ'য়েছে। আজকের কিশোরদের চেতনায়ও এ বই তার ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য ও দৃঢ়বদ্ধ ভাষার মাধ্যমে একই কর্ত্তব্য পালন করতে সমর্থ। যে কবিতা পাঠে মস্তক উন্নীত হয়, হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়, বুক ভরে ওঠে, একই সঙ্গে মুখে হাসি এবং চোখে অশ্রু দেখা দেয়—এমন কাব্যগ্র

বাংলার কিশোরদের জন্য একটি মাত্রই আছে—সেটি 'কথা ও কাহিনী'। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তার স্থান একক ও অনবদ্য। গভীর এক মানবতাবোধ এবং দেশপ্রেম-এর প্রেরণা থেকে রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিনের মধ্যে 'কাহিনী'-র অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছিলেন। সে মানবতাবোধ ও দেশপ্রেম অপরের আত্মসম্মানকে আঘাত করে না এবং প্রেমেও সর্বপ্রকার হীনতা, লোভ এবং দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকে। কিশোর জীবনে এই বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের সম্মুখীন হতে পারা যে কোন দেশের কিশোরদের পক্ষেই সৌভাগ্যের।

'মুকুট' ও 'রাজর্ষি'

॥ এক ॥

বাংলার কিশোর-সাহিত্য সম্ভার খুব বেশী সমৃদ্ধ নয়; যেটুকু তার আভিজাত্য, তারও আরম্ভ রবীন্দ্রনাথ থেকে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই এই, তাঁর বিচরণ ভূমির কোনও সীমা নেই, কোন নির্দিষ্ট পরিধি অথবা কোন সীমাবদ্ধ প্রাঙ্গণে তাঁর পরিক্রমা আবদ্ধ ছিল না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, প্রাণীজগৎ, যেমন ছিল তাঁর অনুভব-উপলব্ধির নিকট উন্মুক্ত, তেমনি মানব জীবনেরও সমস্ত স্তর সমস্ত অধ্যায়ে, তার অন্তর-লোকে তাঁর যাত্রা ছিল অবারিত। শিল্পী-মানস ও রূপসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আলোচনায় কবি একবার বলেছিলেন, আমি মাছের সঙ্গে মাছ হই, গাছের সঙ্গে গাছ। সার্থক এবং অসাধারণ শক্তিধর স্রষ্টামাত্রই তাই—তাঁর উপস্থিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংবেদনায় তিনি এক, অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথও শিশুর সঙ্গে শিশু, কিশোরের সঙ্গে কিশোর; যুবকের সঙ্গে যুবক, বৃদ্ধের সঙ্গে বৃদ্ধ হয়ে জীবনের বিচিত্র লীলা উপভোগ করেছেন এবং এক একটি অনাবিষ্কৃত বিস্ময়কর জগৎ আবিষ্কার করেছেন। আর শুধু তাই নয়, তাঁর আবিষ্কারের আনন্দ পরিবেশন করেছেন আমাদের তাঁর অজস্র সৃষ্টির মাধ্যমে। আমরা মোহিত হয়েছি, বলেছি সুন্দর।

কিশোর-কল্পনার জগৎটিও তাঁরই ধ্যানে পরিপূর্ণ পত্র-পল্লবে ধরা পড়ল। এই জগৎটি যে শিশুদের পৃথিবী থেকে পৃথক এবং বড়োদের পৃথিবী থেকেও অনেক দূরের, এমন ভাবনা রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে যদি কেউ করে থাকেন, তবে কালের বিচারে সে সাহিত্যচিন্তার স্বাক্ষর আজও খুব স্পষ্ট নয়।

একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিশু, কিশোর ও পরিণতবয়স্ক সকল স্তরের মানুষের মনের খোরাক অক্লান্তভাবে যুগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্র-

নাথেরও অনেক আগে ; কিন্তু তাঁর রচনা প্রধানতই ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ এবং অন্তত শিশু বা কিশোরদের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ছিল কাহিনীর মাধ্যমে নীতি-শিক্ষা দানে সীমিত। উপরন্তু, শুধু কিশোরদের জন্যই গল্প লেখবার চেষ্টা তিনি কোনদিন করেন নি, মৌলিক কোন কাহিনী স্বষ্টি তো নয়ই।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আমরা কয়েকজন সাহিত্য-শিল্পীর সাক্ষাৎ পাই যাঁরা শিশু-সাহিত্য স্বষ্টির প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। সম্ভবত 'বালক' পত্রিকার প্রকাশ এবং ঠাকুরবাড়ীর সুনিশ্চিত পৃষ্ঠপোষকতা এই সাহিত্যিক এ্যাড্ভেঞ্চারের ইন্ধন ও প্রেরণা যুগিয়েছিল।

বয়সের দিক থেকে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং কুলদারঞ্জন রায় চৌধুরীকে আমরা প্রায় রবীন্দ্রনাথের সমকাল থেকেই শিশুসাহিত্য পরিবেশনে অগ্রসর হ'তে দেখি। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু তাঁর 'কঙ্কাবতী' প্রভৃতি স্মরণীয় গল্প-উপন্যাসগুলি লেখা হয় 'মুকুট' বা 'রাজর্ষি'-র অনেক পরে। ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যকর্ম শুধু শিশুসাহিত্যে সীমাবদ্ধ ছিল বললে অবিচার করা হবে। বাংলা 'স্যাটায়ার' সাহিত্যে বাংলা উপন্যাস রচনায় এবং রূপকথা ও ভৌতিক কাহিনীর পরিবেশনে তিনি ছিলেন অতুলনীয় শিল্পের স্রষ্টা, এবং যদিও এই অমর সাহিত্য-শিল্পীর নাম আজ আমাদের পাঠক-সমাজের মুখে মুখে ধ্বনিত হয় না, তথাপি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরুচরিত' বা 'কঙ্কাবতী' বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্ভারের সমপর্য্যায়ের, আমাদের সাময়িক বিস্মৃতি সত্ত্বেও। কাহিনীর বর্ণনায় বা ঘটনা-বিন্যাসে সামান্যতম পরিমার্জনা ও পরিবর্জন সম্ভব হলে 'কঙ্কাবতী'-কে আমরা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কিশোর-উপন্যাস বলে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারতাম। কিশোর মনের সমীক্ষণে আমরা পরিণত মনের সমগ্র প্রস্তুতিই

সেখানে দেখতে পাই ; এবং যদিও 'কঙ্কাবতী'-কে সরস সার্থক রূপসৃষ্টির মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা একান্ত অনুচিত, তথাপি একথাও সুনিশ্চিত যে বিশেষতঃ কিশোরদের জন্য লেখা বই 'কঙ্কাবতী' নয়। ত্রৈলোক্যনাথের ভূতের গল্প-গুলোর রসাস্বাদন সব বয়সের সব মানুষের পক্ষেই সম্ভব, তবু সেগুলোকে শিশুপাঠ্য কাহিনী বললেই তাঁর রচনার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও শিল্পগুণ উপলব্ধি করা সহজ হয়। ত্রৈলোক্যনাথের মতই রবীন্দ্রনাথের সমকালে সাহিত্যরচনা করে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার অপরূপ সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'ঠাকুর মা-র ঝুলি', ফার্ষ্ট বয়, লাষ্ট বয়, চারু ও হারু, প্রভৃতি অবিস্মরণীয় শিশু ও কিশোর পাঠ্য গল্প-উপন্যাস রচনা করে দক্ষিণারঞ্জন অদ্যাবধি আমাদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ত্রৈলোক্যনাথের দুর্ভাগ্য, তিনি আজ বিস্মৃত লেখকের তালিকায় একটি অবিস্মরনীয় নাম মাত্র। উপেন্দ্র কিশোরের 'শিশু রামায়ণ' এতদিন বইয়ের বাজরে পাওয়া যেতো না,সুখের কথা আজ তার পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয়েছে। এখন পর্যন্ত শিশুদের জন্য রচিত পদ্যে লেখা এইটিই শ্রেষ্ঠ রামায়ণ। অন্যত্র বিদেশী সাহিত্যের অনবদ্য অনুবাদ পরিবেশন করে বাংলা কিশোর উপন্যাসের জমিনকে অসামান্য উর্বরতা দান করেন কুলদারঞ্জন। কিন্তু, বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক এবং রূপসৃষ্টির যাদুতে ঐশ্বর্যশীল কিশোর উপযোগী বড় গল্প যিনি রচনা করলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং 'বালক' পত্রে প্রকাশিত 'মুকুট' গল্পটিই হলো সেই স্মরণীয় গল্প। এদিক থেকে ত্রৈলোক্যনাথ, দক্ষিণা-রঞ্জন এবং পরবর্তীকালের সার্থক কাহিনীকারগণ তাঁর উত্তরসাধক।

॥ দুই ॥

কিশোর-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম অবদান তাঁর বড় গল্প 'মুকুট' * এবং একই বৎসরে 'বালক' পত্রিকার তিনি ধারাবাহিকভাবে 'রাজর্ষি' উপন্যাস

* ১২৯২ সালে 'বালক' পত্রে মুকুট প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে একটিমাত্রই উপন্যাস তিনি রচনা করেছিলেন, ১২৮৮-৮৯ সালে 'বৌ ঠাকুরানীর হাট'।

সুতরাং, মুখ্যত কিশোরদের জন্য লিখিত হলেও কথা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'মুকুট' এবং 'রাজর্ষি' তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। পরবর্তীকালে, প্রায় বাইশ তেইশ বৎসর পরে, রবীন্দ্রনাথ 'মুকুট' গল্পটিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন এবং মূল বক্তব্যের আংশিক পরিমার্জনা করে একই নামে একটি নাটক রচনা করেন। এবং কিশোরদের অভিনয়োপযোগী প্রথম নাটকও এভাবে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃকই রচিত হলো। এর জন্য স্রষ্টার সঙ্গে আর যাঁরা আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার অধিকারী তাঁরা হলেন শান্তিনিকেতনের বালকেরা। তাঁদের জীবনে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ, আনন্দের সঙ্গে শিল্পরুচি, শিল্পরুচির সঙ্গে মনের ঔদার্য, এবং ঔদার্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য নিয়ে আসার জন্যই তিনি গল্পটিকে নাটকে রূপায়িত করেছিলেন, এবং কবি তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্যসাধনায় কিশোরদের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত ঐ একটিমাত্রই পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখে গেছেন। 'বিসর্জ্জন' এবং 'ডাকঘর' যদিও কিশোর মনোজগতের বাইরে নয়, এমন কি বালক-বালিকাদের দ্বারাই তাদের মঞ্চরূপায়ণ সম্ভব, তথাপি শুধু কোন বিশেষ বয়সের বালকবালিকাদের অভিনয়ের জন্যই এদের সৃষ্টি নয়।

'মুকুট', গল্প ও নাটক, এবং 'রাজর্ষি' এই তিনটি বইয়ের চরিত্রগুলো পাশাপাশি রেখে এবং তাদের ভাবসম্পদ ও রচনাকালকে রবীন্দ্র-জীবনীর পটভূমিতে রেখে যদি বিচার করি, এবং ঐ গ্রন্থে উত্থাপিত সমস্যার গভীরে অবগাহনের চেষ্টা করি, তাহলে একটা অস্পষ্ট কিন্তু সুতীব্র বোধ আমাদের চেতনাকে প্রহার করে, যেন কিছুটা আচ্ছন্নও করতে চায়। একটা ক্ষীণ আলোর রেখা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে হয়ে যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, যেখান থেকে তাকে পুনরায় উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন। এবং সেই অন্ধকার থেকে আলোতে প্রত্যাবর্তনও যেন অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু, তাঁর সৃষ্টিকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই ; অন্ধকার সত্ত্বেও তা সুন্দর, তাঁর রচনা সহজ সৌন্দর্যে

উজ্জ্বল। সেজন্যই মনে হয়, অন্তরালের অন্ধকার যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে জ্যোতিতে তার প্রকাশ শুধু সরস নয়, বিস্ময়কর। কী বিচিত্র পথে শিল্পীমনের আনাগোনা, তার স্বাক্ষরও এখানেই মিলবে। বোধহয় সমাধানও।

আত্মকলহ, পারিবারিক বিরোধ, এবং বিশেষ করে ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব এই তিনটি গ্রন্থের উপজীব্য। জীবনের ঐ বিশেষ অধ্যায়ে কবি-চিত্ত এইসব সমস্যা এবং তার পরিণাম-চিন্তায় অত্যন্ত বেশি আলোড়িত হয়েছিল বলে মনে হয়। রচনার আপাত প্রশান্তির অন্তরালে তাঁর চিত্ত যে যন্ত্রণায় ব্যথায় পীড়নে ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তা সহজেই অনুমান করা চলে। যন্ত্রণাকে অতিক্রম করেই তো রূপের সৃষ্টি; ব্যথাকে উত্তীর্ণ হওয়া অনুভবই তো শিল্পের অভিব্যক্তি। ১২৮৮ থেকে ১২৯২ সালের মধ্যে এবং এই দুই সীমার আগে পিছে এইসব গল্প ও উপন্যাসের স্রষ্টার জীবনে কোন্ অনুভব কাজ করছিল এবং কেন করছিল, কোন্ যন্ত্রণায়ই বা তিনি কেঁদে উঠেছিলেন যার পরিমার্জিত শিল্প-অভিব্যক্তি তাঁর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল অন্তরকে শান্ত করার জন্য কেনই বা তিনি শিল্পে মুক্তি কামনা করেছিলেন, এ সম্পর্কে আমাদের মনে কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা জাগে। নিজের জীবনেই কবি অনুরূপ ভ্রাতৃবিরোধের দুঃস্বপ্ন ঘনিষ্ঠ দেখেছিলেন কিনা, যাকে তাঁর কবিচিত্তের কোমলতা সযত্নে পরিহার করলেও কঠিন গদ্যসাহিত্যের মাধ্যমে যার প্রকাশ সেদিন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল, এ জিজ্ঞাসা মনে স্বতঃই উঁকি দেয়। এই প্রশ্ন নিয়ে যদি আমরা রবীন্দ্র-জীবনীর ঘটনাপঞ্জীর অরণ্যে প্রবেশ করি, তাহলে কয়েকটি সমসাময়িক পারিবারিক ঘটনা আমাদের দৃষ্টিতে আসে। সেই ঘটনাগুলো উৎসবের এবং বিচ্ছেদের মিলনের এবং যন্ত্রণার, দুঃখের এবং যন্ত্রণারই বেশি।*

---

* ১২৯১ সালে বিশেষ করে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে যা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের গতিকে নিরূপিত ও নির্দিষ্ট করেছে। এই বৎসর তাঁর বিবাহ হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করেন, এবং কবি ভ্রাতৃদ্বয় সারদাপ্রসাদ ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ-এর মৃত্যু হয়। কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা রবীন্দ্রজীবনে এক অশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুর্ঘটনা। রবীন্দ্র-জীবনের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি বোধ করি এখানেই।

এ সময়ে যুবক রবীন্দ্রনাথ যে প্রায়শই ভ্রাতৃবিরোধের দুঃস্বপ্ন দেখতেন, তার একটি প্রমাণ 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কাহিনী, যা তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃবিরোধের অপূরণীয় ক্ষতিতেই আত্মসমর্পিত হল। (স্বপ্নে দেখা ঘটনার সঙ্গে ভ্রাতৃবিরোধ-এর কাহিনী যুক্ত করা হয়েছে।) শিল্পীমন কোন্ জটিল পথে আপন কাজ করে যায়, তাঁর মানসপ্রকরণের বিশিষ্ট ভঙ্গী কি, তা আমাদের গোচরে নেই, হয়ত বা কোনকালেই থাকবে না; এবং কী করে একান্ত ব্যক্তিক সুখ দুঃখবোধ, একলার সমস্যা, মানবিক বোধে বহুর সমস্যায় রূপায়িত হয়, সে রহস্য আমাদের জানা নেই, হয়ত কখনও জানা যাবে না। কিন্তু ব্যাধি বা যন্ত্রণার হাত থেকে মানুষ মুক্তি চায়, রবীন্দ্রমানসে সে-কালে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও বোধ করি ছিল আত্যন্তিক।

অবশ্য, বলা বাহুল্য, সামাজিক উপন্যাস বা গল্পের পটভূমিকায় এই মানসিক যন্ত্রণাকে প্রতিফলিত করার দুঃসাহস হয়ত সেদিন তাঁর ছিল না, হয়ত বা সামাজিক উপন্যাস রচনার অসামান্য দক্ষতাও কবি তখনও অর্জন করেন নি; সম্ভবত, সামাজিক পটভূমিতে তলাকার অন্ধকারটাই অতিশয় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত, যেটা কারও অভিপ্রেত নয়। কবি-মানস তাই অন্য পথেই মুক্তি অর্জন করল। তিনি ঐতিহাসিক গল্পকাহিনীর মাধ্যমে সেই যন্ত্রণাকে প্রতিফলিত করলেন যা তাঁর নিজেরই নিয়তি; সেখানে তিনি যে-চরিত্রের অভিনেতাই হোন না কেন, তিনি নিজেও সেই নিয়তির নিকট পরাভূত শিকার। অপর চরিত্রগুলো কারা, অথবা কারা হ'তে পারেন, আজ অস্পষ্ট অনুমানের বেশি আর তাদের অন্বেষণ করা সম্ভব নয়। সম্ভবত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যাঁর সঙ্গে সেই সময়েই রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্যিক মতবিরোধ প্রচণ্ড এবং সমাজিকতা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্পর্কে বৈষম্য স্পষ্টতর হচ্ছিল—নাটকের কোন একটি অস্পষ্ট চরিত্র। অথবা অন্য একজন, যিনি কবির একান্ত ঘনিষ্ঠ, সত্তার দোসর, যাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের কল্পনা মৃত্যুর মতই করুণ এবং যন্ত্রণার।

॥ তিন ॥

আমাদের অনুমান এবং কল্পনাকে এইখানে সীমাবদ্ধ রেখে, এবং কবির পূর্বোক্ত মানস-পরিবেশের ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করে আমরা গ্রন্থালোচনায় ফিরে আসি। 'মুকুট' গল্পও একই নামের নাটকের মধ্যে পটভূমিকা ও কাহিনীর বিন্যাসে কোন পার্থক্য নেই, শুধু শেষ দৃশ্যের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনটুকু ছাড়া। এই পরিবর্তন নাটকের এবং গল্পের চরিত্রের মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য এনে দিয়েছে। গল্প যেখানে শুধুই ট্র্যাজেডি, নাটক সেখানে নাটকীয় কারণেই মিলনান্তক, তার চারিপার্শ্বের মৃত্যুর ভয়াবহ ছায়া থাকা সত্ত্বেও। এই পরিবর্তনে দুই কাহিনীরই নায়ক রাজধরের চরিত্রেও কিছুটা সংস্কার ও রূপান্তর এনে দিয়েছে। গল্পের রাজধর সব দিক থেকেই ঈর্ষা ও ষড়যন্ত্রের বিষে রুগ্ন, এবং অপরিশুদ্ধ ; নাটকের রাজধর তার সমস্ত ত্রুটিকে অতিক্রম করে যুবরাজের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসায় উজ্জ্বল। গল্পের রাজধর স্বদেশের সর্বনাশেও নিজের পরিণত ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর, নাটকের রাজধর সমস্ত হীন ষড়যন্ত্রের মধ্যেও কখনও স্বদেশকে সর্বনাশের অতলে তলিয়ে দেয় না, নদীগর্ভে বিসর্জিত জয়ের মুকুটকে সে পুনরুদ্ধার করে। কাজেই, আত্মকলহের বিষে জর্জরিত নাটকীয় কাহিনীতে শেষ পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলার মত মুক্তি মেলে ; উপন্যাসে সে মুক্তি নেই, ভ্রাতৃকলহ এখানে পরিণামে ভীষণ অভিব্যক্তিতে ভয়াবহ ; এবং শেষ পর্যন্ত রাজত্বলাভেও রাজধরের কোনরূপ আত্মিক সুখ বা বৈষয়িক প্রাপ্তি ঘটে না, এমন কি চিত্তের নীচতাজনিত অনুতাপে পরিশুদ্ধ হবার সুযোগও তার জীবনে মেলে না। হীন স্বার্থচেতনার সীমায় সে জীবন এতই সীমিত ও ক্ষুদ্র।

'মুকুট'-এর কাহিনী একই রাজপরিবারের তিন ভাই-কে নিয়ে রচিত যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং চরিত্রগত পার্থক্য গল্প ও নাটক উভয়ক্ষেত্রেই সুস্পষ্টরূপে চিত্রায়িত। বড় ভাই যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের মতই নিছক ভাল মানুষ ; তিনি যতটা নির্ভয়ে ও প্রেমে উজ্জ্বল, ততটা অস্ত্রকুশলী নন। মেজকুমার ইন্দ্রকুমার প্রকৃতই বীরপুরুষ, প্রায় মহাভারতের মধ্যম পাণ্ডবের মত ; এবং অস্ত্রগুরু ঈশা খাঁর

তিনি পরম স্নেহের পাত্র। ছোট কুমার রাজধর দুর্যোধনের দ্বিতীয় সংস্করণ, গল্পে দুর্যোধনের তুলনায় তার পৌরুষ কম এবং হীনতা বেশী। নাটকে এবং গল্পে উভয়ক্ষেত্রেই রাজধর এবং ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে যুবরাজের সম্পর্ক প্রীতি ও মমতায় স্নিগ্ধ; মহাভারতের তুলনীয় সম্পর্ক তাই শুধু ইন্দ্রকুমার ও রাজধরের মধ্যেই সক্রিয়, সেই একই ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা, ষড়যন্ত্র। গল্পে এই ষড়যন্ত্রে ধর্ম পরাজিত, প্রেম পরাহত। এখানে পরিণাম, কুরুক্ষেত্রের তুলনায় নেই, আছে দ্বারকায়। শেষ পর্যন্ত বিদেশী দস্যুদলের হাতে রাজ্য তুলে দেওয়াতেই কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে। নাটকে দ্বারকার ভয়াবহ পরিণাম নেই, কেননা শেষ পর্যন্ত যুবরাজের অকৃত্রিম স্নেহ দুই ভাইকে মেলাতে সমর্থ হয়, এবং ঈর্ষা ও ভ্রাতৃকলহ প্রেমে পরাজয় স্বীকার করে।

দুইটি কাহিনীর তুলনামূলক বিচারে অগ্রসর হ'লেই আমরা যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই, তা হ'লো শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে নানা দিক থেকেই সার্থক তাই নন, নাটক এবং গল্পের কাহিনী-বিন্যাসে কোথায় কতখানি পরিবর্তন পরিমার্জনা সংসাধনীয়, সে সম্পর্কে প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ সজাগ এবং সম্বুদ্ধ ছিলেন। পারিবারিক ঈর্ষা ও ভ্রাতৃকলহের পরিণাম কি সে সম্পর্কে কিশোরদের সচেতন ক'রতে তিনি সর্বনাশকে তার সমস্ত ভয়াবহ পরিণামের মধ্যেই পরিস্ফুট করেছেন, ষড়যন্ত্রী রাজধরের অনুকূলে সামান্যতম কোমলতা ও করুণাকেও কিশোরদের মনে সক্রিয় হ'তে দেন নি, যদিও এই কলহের উৎপত্তি ও বিকাশে ইন্দ্রকুমারও একজন অংশীদার। নাটকে কিন্তু কিশোদের দর্শনের সামনে পরিণামের এ তীব্রতা তিনি উপস্থিত রাখেন নি, সমস্ত হীনতা ও সর্বনাশের চাইতে প্রেম উর্দ্ধে এবং আত্মঘাতী কলহের ভয়ঙ্কর পরিণামকে প্রেম কোমল ও পরিশুদ্ধ করে—কিশোর দর্শকদের সামনে মুক্তির এই দরজাটুকু তিনি উন্মুক্ত রাখলেন। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কিশোর-নাটকের এই আদর্শগত প্রাপ্তির অবকাশটুকু রচনা খুবই সঙ্গত হ'য়েছে। ঐতিহাসিক গল্পে এই নাটকীয় উপসংহার বেমানানই হ'তো, সেখানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পদায়িত্ব সম্পর্কে

সজাগ ছিলেন। অবশ্য, গল্প ও নাটক রচনার অন্তর্বর্তীকালীন কাল-ব্যবধানকে সব সময়েই আমাদের স্মরণে রাখতে হ'বে। গল্প রচনার কালে কবি-মানস উপস্থিত প্রেরণার আঘাতে উদ্বেল, পরিণামচিন্তায় বিক্ষুব্ধ ; সুদীর্ঘকাল পরে, নাটক রচনার সময়, সেই বিক্ষোভই প্রশান্তিতে সমাহিত ; প্রেমে অভিষিক্ত। গল্পে তাই বিক্ষোভের, এবং নাটকে প্রেমের প্রাধান্য একান্তই স্বাভাবিক।

॥ চার ॥

'মুকুট' গল্প ও নাটক রচনার পরবর্তীকালে এবং এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কিশোরদের উপযোগী গল্প উপন্যাস প্রচুর রচিত হয়েছে,—এবং সাহিত্যরসের বিচারে 'মুকুট'-এর সার্থকতা ও শিল্প-সৌকর্যকে ছাড়িয়ে গেছে এমন কিশোরপাঠ্য গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা সৌভাগ্যক্রমে বাংলায় অল্প নেই। দক্ষিণারঞ্জন, গিরীন্দ্রশেখর, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ বাংলা কিশোর সাহিত্যকে 'ক্লাসিক'-এর মর্যাদা দান করেছেন, এবং বিদেশে (যদিও ইংরেজী ভাষায়) ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর চিত্রগ্রীব ও যুথপতি রচনা করে আমাদের মুখোজ্জ্বল করেছেন। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কিশোর গল্প বা উপন্যাস কিন্তু আমাদের দেশে খুব বেশি রচিত হয়নি, এবং এ ধরনের সার্থক গল্প এক অবনীন্দ্রনাথের 'নালক' ছাড়া আমাদের স্মরণে আর নেই।

তুলনায় ইতিহাস-আশ্রিত কিশোর-অভিনয়োপযোগী নাটক বাংলায় রচিত হয়েছে অনেক, কিন্তু আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' ছাড়া অন্য কোন নাটককে আমরা ক্লাসিকের পর্যায়ে ফেলতে পারি কিনা সন্দেহ। কিশোরদের অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত, এমন সার্থক নাটক এ পর্যন্ত একটি মাত্রই রচিত হয়েছে, এবং সে নাটক প্রথম কিশোর-নাটক 'মুকুট'।

কিন্তু রসের আবেদনে 'রাজর্ষি' ততটা আকর্ষণীয় নয়, এবং কিশোরচিত্তকে বিমোহিত করে রাখার মত সাহিত্য-গুণ এ গ্রন্থের বিশেষ আছে বলে মনে

হয় না। সম্ভবত সে কারণেই এর নাট্যরূপ 'বিসর্জন'-এ উপন্যাসের অনেক বাহুল্য বর্জিত হয়েছে। অবশ্য, অন্তরসম্পদের বিশ্লেষণে এই দুইটি গ্রন্থকে এক বলা কঠিন। কারণ, 'রাজর্ষি'-র কেন্দ্রস্থ ভাব ও ঘটনা ভ্রাতৃবিরোধ, 'বিসর্জন'-এর অহিংসা ও পূজায় বলিদান। উপন্যাসে ত্রিপুরার ইতিহাসকে কবির স্বপ্নলব্ধ ঘটনার ("বাবা, একি ! এ যে রক্ত ! ইত্যাদি) সঙ্গে মেলানো হয়েছে, কিন্তু সে মিশ্রণ রসের রসায়ণে অন্তরঙ্গ হয়েছে—বলা যায় না। বরং, নাটকের নির্দিষ্ট সীমায় কবির হৃদয়ানুভূতি অন্যপথে অধিকতর মূল্য ও সার্থকতা অর্জন করেছে। 'বিসর্জন' মানবিক আবেদনের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল, আত্মানুভূতি ও আত্মত্যাগের মহিমায় বলিষ্ঠ। 'রাজর্ষি' তুলনায় অনেকটা নীরস ; আদর্শের ব্যঞ্জনা তাতে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে আদর্শ যেন heroworship-এ পর্যবসিত, শিল্প-সুষমায় প্রতিষ্ঠিত নয়।

তাছাড়া' 'রাজর্ষি, অথবা 'বিসর্জন' কোনটিই শিশুপাঠ্য বা কিশোরপাঠ্য গল্প নাটক বলে চিহ্নিত হবার মত গ্রন্থ নয়। 'রাজর্ষি' সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, 'বালক' পত্রিকায় এই উপন্যাসের সুরু হ'লেও কাহিনীর পরিণতিতে তা শেষ পর্যন্ত বালক-উপযোগী থাকেনি। 'বিসর্জন' নাটকের ঘটনাবিন্যাস ও সংলাপও কিশোরচিত্তের উপযোগী নয়। কিন্তু, নাটকটি যেহেতু গভীর মানবিক মূল্যবোধের আশ্রয়, সেহেতু, আমাদের বিশ্বাস, শিশুচিত্ত তাতে আনন্দে সাড়া দেবে, এবং বোধ, অনুভব ও কল্পনার ব্যাপ্তিতে হ'বে' উদ্ভাসিত।

'ডাকঘর'

॥ এক ॥

অন্তর-সম্পদের বিশ্লেষণে যদিও ডাকঘর 'শিশু-সাহিত্যের' পর্যায়ে আলোচিত হওয়ার গ্রন্থ নয়, তথাপি অমলের আকূতির তীব্রতা ও যন্ত্রণা-বোধ শিশু-চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে বলে আমরা এই গ্রন্থটিকে বর্তমান আলোচনার পর্যায়ভুক্ত করে রবীন্দ্র-শিশুমানসের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।

'ডাকঘর'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শৈশবের স্মৃতি জড়িত। রুদ্ধকক্ষের চার দেয়ালে তাঁর ছুটে বেড়ানোর কামনা প্রতিহত হ'য়ে সম্ভবত পুনরায় তাঁর অন্তরে এসে সঞ্চিত হ'তো; এবং সেখানকার স্তব্ধ অক্ষমতায় অশান্ত ক্রন্দনে ক্ষণে ক্ষণে গর্জে উঠতো। অমলের অনুভবের আত্যন্তিকতায় যেন শিশু-রবীন্দ্রনাথের অনুভবের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া 'ডাকঘর' রচনাকালীন যে মানস-পরিবেশ তা বিশ্লেষণ করলেও কবির অন্তর্নিহিত শিশুসত্তাটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

'ডাকঘর' রচনার অব্যবহিত পূর্বক্ষণে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের পথে ছুটে বেড়ানোর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিলেন; কিন্তু 'নানা সাংসারিক ও আর্থিক কারণে' তাঁর অভিলাষ' চরিতার্থ হয়নি। এই সাংসারিক কারণগুলো কি, অনুমান করার উপায় নেই, কিন্তু সেগুলো যে পরিণতিতে গভীর মর্মপীড়াদায়ক, রবীন্দ্র-জীবনীর পৃষ্ঠায় তা অনায়াসলক্ষ্য।' * রবীন্দ্রনাথের নিকট তখন নির্জনতার প্রয়োজন অত্যধিক; এমন কি, মৃত্যুর চিন্তাও মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। শিলাইদহ থেকে হেমলতা দেবীকে লেখা কবির পত্রের সাক্ষ্য এইরূপ: "এ জায়গাটা বেশ ভাল লাগছে—নির্জনে ভাল থাকব বলেই মনে

---

* রবীন্দ্র-জীবনী; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ২৫০–২৫১।

হচ্ছে, পদ্মায় শরীরও ভাল থাকবে। যেমন করে হোক্ নিজের গর্তটার ভিতর থেকে নিজের নির্মল বিশুদ্ধ সত্তাটিকে বাহির করে আনতেই হবে।………মৃত্যু ভালো, কিন্তু মুক্তি চাই……খোলা রাস্তার খোলা আলোয় খোলা হাওয়ায় ডাক পড়েছে……আবরণ সব জীর্ণ হয়েছে মলিন হয়েছে সেগুলো এবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক—সর্বাঙ্গে লাগুক আকাশ।" শিলাইদহে কিছুদিন কাটিয়ে আসার পরও কবিচিত্তের অন্ধকার দূর হয়নি, তখনও যন্ত্রণায় তিনি পাণ্ডুর, নিজের খণ্ডিত সীমা পার হয়ে কিছুতেই দুঃখবোধের উর্ধ্বে উঠতে পারছেন না। 'ডাকঘর' রচনার পটভূমি সম্পর্কে কবির নিজস্ব বিশ্লেষণ এইরূপ : "সে সময়ে বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দু'টো তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই-যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল।……আমার মনে হচ্ছিল, একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। ষ্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন তখন আমার দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে. সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম।"

এই দু'টো উদ্ধৃতি বিচার করলে দেখা যায় যে, আর্থিক অসুবিধার মধ্যে, সংসার পরিস্থিতে ব্যক্তিগত জীবনে কবির যে অভিজ্ঞতাই হয়ে থাকুক না কেন, এবং যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, তার ওপর যেন কবির কর্তৃত্ব ছিল না, অথবা তাকে আয়ত্তাধীন করাও যেন কবির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সেজন্য, একটা দুঃসহ অসহায়-বোধে কবি যেন বিষন্ন, ম্রিয়মান। জীবনে যা আসছে, যা ঘটছে, তা যেন অভিপ্রেত নয়, অথবা তার ওপর কবির কোন হাতও নেই। অন্তরের অভিলাষ পূরণ করার শক্তি যেন তাঁর ছিল না, তেমনি সর্ব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে পারার শক্তিরও ছিল নিদারুণ অভাব। অথচ, এই ব্যর্থতার মধ্যে, যা অনভিপ্রেত তাই আপনাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে

যা অনাহুত তাই হৃদয় জুড়ে আপন বিস্তার ছড়িয়ে দিয়েছে। তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই, যেন অশক্ত চিত্তে তাকে আসতে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। যেন কবির ইচ্ছাকে ছাপিয়ে অন্যের আকাঙ্ক্ষাই কবির চাওয়া-না-চাওয়ার ওপর জয়ী হয়েছিল। সুতরাং, সেদিন রবীন্দ্রনাথ যদি একদিকে অচরিতার্থ কামনার ঝড়ে, এবং অন্যদিকে অনভিপ্রেতকে মেনে নেওয়ার বেদনায়, বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বরং বিক্ষোভই তাঁকে শিশু-মনের কাছাকাছি টেনে নিয়ে গিয়েছে। কারণ, এই বিক্ষোভ ও ঝড়, বেদনা ও পীড়ন, শিশু-মনেরই একান্ত আপনার; শিশুকেও তেমনি অপূর্ণ ইচ্ছার বেদনায়, বড়োদের ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে চলতে বাধ্য হওয়ার দুঃখে, অন্যের অসঙ্গত অভিপ্রায়কে প্রতিহত করতে না পারার অপরিসীম লজ্জায় সঙ্কুচিত হতে হয়; তাকে আপন ক্ষুদ্র পৃথিবীর অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে ব্যর্থতার চেতনায় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে হয়; তখন সম্ভবত অলক্ষ্য ঝড়ের দাপটে মথিত হয় সে, কোন কোন সময়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এই ঝড়ের অভিব্যক্তির সাদৃশ্যে শিশু-মনের সঙ্গে পরিণত রবীন্দ্র-মানসের সাদৃশ্য, ছোটর সঙ্গে বড়ো মনের মিল।

আর শুধু তাই বা বলি কেন, এই বিক্ষোভ ও ঝড় অসহায় মানবমনেরই ঝড়। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই এমনি দুঃসময় আসে, যখন সমস্ত আত্ম-কর্তৃত্ব ও আত্মবিশ্বাস বিসর্জন দিয়ে তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়, যখন জীবনচক্রের ঢেউ তার সমস্ত আশা আকাঙ্খাকে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়ে যায়, যখন প্রতিটি মানুষ শিশুর মতই অক্ষমতার চেতনায় অসহায়তার বোধে বিষন্ন হয়, যখন নির্জন নিরালায় আপন মনকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে, সমস্ত অঙ্গে আকাশকে পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে। সেই সব লগ্নে এবং আজীবন, প্রতিটি মানুষই এক অর্থে শিশু-মানুষ।

'ডাকঘর' পাঠে বড়োরা যে আনন্দ পান, তা সম্ভবত অনেকটা এ কারণেও। যে কোনও স্থূল বাস্তব সমস্যাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্র-মানস অতি সহজেই বিমূর্ত

ভাব-রাজ্যে উপনীত হয়, যেখানে সমস্যার স্থূলত্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন তা এমন একটা ব্যঞ্জনা লাভ করে, যে তাকে কোন দেশের কোন বিশেষ কালের নির্দিষ্ট সমস্যা বলে চিহ্নিত করা সম্ভব না হলেও রসিক মনে তার অনস্বীকার্য আবেদন থেকে যায়। সেটা যেন একটা অনির্দিষ্ট অনির্দেশ্য আকূতি, যার লক্ষ্য অতল সমুদ্র-গর্ভ, অথবা অনন্ত মহাকাশ। এই আকূতি সংবেদনশীল চিত্তের স্বরূপ। এবং এইরূপ আকূতিহীন মানুষ অচিন্তনীয়।

'ডাকঘর' পাঠে শিশু-মন আনন্দিত হয় অন্য কারণে। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদের আস্বাদ গ্রহন করা বা তার শব্দার্থগত তাৎপর্যের অন্তরালে ব্যঞ্জনাময় অর্থ উপলব্ধি করা, শিশু-মন বা কিশোর-মনের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু, তা না হলেও, এর রসগ্রহণে অসুবিধা হয় না। কারণ 'ডাকঘর'-এর কাহিনী সমাবেশ এমনই বিচিত্র এবং চরিত্রগুলোও এমন যে, কিশোর-মন তা অল্পায়াসে উপভোগ করতে পারে। আর, এর নাট্যগুণ তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য না হলে ও এর সার্থক অভিনয় কিশোরচিত্তকে আকৃষ্ট করে বলেই আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।

আবেষ্টনীর পীড়ন এবং বড়োদের জগতের অবাঞ্ছিত বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য শিশুচিত্তে যে আর্তনাদ থাকে, যে অব্যক্ত আকূতিতে তার সমস্ত দেহমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে 'ডাকঘর'-এর মূল সুর একাত্ম। অবশ্য, কোনরূপ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার পথে বা দার্শনিক মীমাংসার মাঝে শিশু এই মিলের সাক্ষাৎ পায় না ; মিল যেন তার চৈতন্যকে উজ্জ্বল করে অকস্মাৎ প্রকটিত হয়, যেন অকস্মাৎ সে তার অন্তর পিপাসাকে অভিনয়ের দেহ-ভঙ্গিমার মধ্যে বা গ্রন্থের পাতায় মূর্ত দেখতে পায়, যেন তারই একান্ত আকূতি রূপধারণ সেখানে অস্তিত্বশীল হয়েছে। শিল্পকর্মের প্রভাব ও আবেদনের বৈশিষ্ট্যই এই : যুক্তিবাহী ধারায় যতটা তাকে পাওয়া যায়, ততটা বা ততোধিক উপলব্ধি করি অনির্দেশ্য অনুভূতি গ্রাহ্যতার সত্যতায় ; বিশ্লেষণের মাধ্যমে যতটা ধরা যায়, ধরা যায় না তার চেয়ে ঢের বেশি। হঠাৎ আলোর স্পর্শে সমগ্র চিত্তপট যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

শিশুচিত্তও তেমনি সাড়া দেয়। তাছাড়া, শিশুর কাছে নাটকের অপর আকর্ষণ তার চরিত্রগুলো। ঠাকুরদা, ফকির, দইওয়ালা, শশী মালিনীর মেয়ে সুধা, এরা আমাদের সত্যজগতের সত্যমানুষ না হলেও, মুক্ত এক মানস-জগতের অধিবাসী; এরা মুক্তির, আনন্দের, দায়িত্বহীন দূত। কোন দায়িত্ব পালনের জন্য এদের আহ্বান নয়, এদের আহ্বান আনন্দ বিতরণের জন্য।

যে-কোন বিরুদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তির জন্য অসহায় মানুষ যখন আর্তনাদ করে ওঠে, তখন 'ডাকঘর' তার চেতনায় সত্য হয়ে ওঠে। এ পথ কর্ম্মের পথ নয়, সংগ্রামেরও নয়; প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডের পথে বিরুদ্ধতার ওপর জয়ী হওয়ার পথও এ পথ নয়। কিন্তু অসহায় মানবশিশু বা শিশু-মানুষ তার মূল প্রেরণার সঙ্গে একাত্ম। সে ক্ষেত্রে এর আকর্ষণ দুর্বার।

॥ দুই ॥

ভালমন্দ অথবা আবেদনের প্রশ্ন ছেড়ে এবার বিশ্লেষণে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কোথায়ও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা" উভয়ে মিলে 'ডাকঘর' রচনার উপস্থিত প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বা জ্ঞানত কোনরূপ তত্ত্বালোচনা ও অধ্যাত্মচিন্তার বশবর্তী হয়ে 'ডাকঘর' রচনায় হস্তক্ষেপ করেননি। তথাপি, উপস্থিত গরজের আত্যন্তিকতাকে অতিক্রম করে, বর্তমানকালের জীবনবিন্যাসের পটভূমিতে রেখে এই নাটকটির অন্যতর ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সম্ভব। বস্তুত, অধ্যাত্মবাদীরা এখানে বিস্তর অধ্যাত্মরসের সন্ধান পেয়েছেন। আমাদের মনে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে অন্যরূপ, তা বলাই বাহুল্য।

সার্থক শিল্পকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই: যে প্রাথমিক উপকরণ নিয়ে শিল্পী শিল্পকর্মে প্রবৃত্ত হন, সৃজন-প্রক্রিয়ার পথে তাঁর সৃষ্টি দৃষ্টির অগোচরে আরম্ভের সেই অসংগঠিত প্রেরণাও উপকরণকে ছাড়িয়ে যায়, ছাপিয়ে যায়;

পরিণত শিল্পরূপে তার সাক্ষাৎ আর কোথায়ও পাওয়া দুষ্কর। সেইজন্য স্রষ্টার মনে বা আন্তর-সত্তায় শিল্পের একরূপ, রসিক মানসের উপলব্ধিতে বা তার সর্বগত সত্তায় আর এক রূপ। যা ব্যক্তিগত তা-ই সর্বগত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সেজন্যই, তার আবেদনের সম্ভাবনার শেষ নেই, মানবমনের মতই তা বিচিত্র।

'ডাকঘর', এক অর্থে, মানবসভ্যতার ট্র্যাজেডি। মানুষ তার আদি জৈব অস্তিত্ব—যেখানে অন্যান্য জীবজন্তুর মতই প্রকৃতির সঙ্গে সে একাত্ম, অভিন্ন—পার হয়ে প্রকৃতির সমস্ত বিরুদ্ধতাকে জয় করতে চেয়েছে সভ্যতার পত্তন করে; সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা, প্রকৃতির অজানা রহস্যের আবিষ্কার এবং মানবিক প্রয়োজনীয়তার ব্যবহার, ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে নব নব রূপে আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়েছে সে। তার সত্তারও হয়েছে নবরূপায়ণ; জীব-মানুষ মানবিক মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনতা নিয়মবন্ধন-জয়ের মুক্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, সভ্যতার পথে, নব নব জন্মের প্রেরণায়, তার যাত্রা তাকে মুক্তির ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত করেনি; এ তাকে যেমন দেয়নি নন্দন-সুখের উপভোগ, তেমনি দেয়নি দুঃখবেদনা ও যন্ত্রণা-মুক্ত আনন্দ। তার সৃষ্টিই তাঁর শৃঙ্খলে পরিণত হ'ল। সেই শৃঙ্খলের পীড়ন বর্তমানকালে এমন একটা দুঃসহ পর্যায়ে উপনীত যে, মুক্তির স্নিগ্ধ হাওয়া যেন মানবিক পৃথিবীর কোন এক কোণেও আর বইছে না, যেন সোজা হয়ে দাঁড়াবার ঠাঁইটুকুও মানুষের জন্য আর অবশিষ্ট নেই। অথচ, এই যাত্রাকে কোন এক বিন্দুতে স্তব্ধ নিঃশেষিত করাও মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

এই স্ববিরোধে মানুষের যাত্রা, সভ্যতার অভিযান, ক্ষতবিক্ষত, যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট। সেই কারণে মনস্তাত্ত্বিকগণ মনুষের এই মুক্তিকে,—প্রকৃতির বুক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নবজন্মের পথে ক্রম-পরিণতিকে—মূলত একটা 'নেতীবাচক' ক্রিয়া বলে বিশ্লেষণ করেছেন।* একদিকে অধিকতর মুক্তিলাভের আকূতি, অন্যদিকে

* "We are never free from two conflicting tendencies: one, to emerge from the womb, from the animal form of existence into a

প্রকৃতির বুকে নিরাপদ আশ্রয়লাভের আগ্রহ—এই দুই স্ব-বিরোধী প্রেরণায় মানবিক ইতিহাস বিপর্যস্ত। বিপর্যয় থেকে আসে মানসিক অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, এমনকি ব্যাধি পর্যন্ত, যা থেকে নিষ্কৃতি সহজলভ্য নয়। মানব সভ্যতা এই ট্র্যাজেডির পথ উন্মুক্ত করে রেখেছে, এবং এই ট্র্যাজেডি কম বেশি প্রত্যেকটি মানুষের। মুক্তির অমৃত-পথযাত্রী তার সভ্যতা, অথচ এই সভ্যতাই অন্যদিকে তার বন্ধন। এই দ্বৈত-সত্তার আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে আধুনিক কালের মানুষের জীবন নিষ্পেষণে জর্জর, শ্বাসরুদ্ধপ্রায়।

মাধব দত্তকে এই সভ্যতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যায়। মানুষকে সে ভালবাসে, সুস্থ মুক্ত আনন্দঘন জীবনের পথে সে তাকে নিয়ে যেতে চায়, এই তার কামনা। কিন্তু, তার কামনার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তির পথে, অজ্ঞাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সে মানুষকে পীড়ন করে, তার মৃত্যুকেও ডেকে আনে। মাধব দত্ত অমলকে বাঁচাতে চেয়েছিল সামাজিক নিয়ম শাসনের মধ্য দিয়ে, তার সমাজ-স্বীকৃত ব্যবস্থাদির অনুপান দিয়ে ; কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরবিশ্বের পথ, প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কের নির্ভরশীলতার পথ অমলের রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাধব দত্তর নির্দেশিত বাঁচার পথ অমলের অন্য এক বন্ধন, অন্য এক যন্ত্রণা, অন্য এক মৃত্যুর সম্ভাবনা-পথ উন্মুক্ত করে রেখেছিল, যে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে মানুষ, অর্থাৎ যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট অমল, আদপেই প্রস্তুত নয়। মাধব দত্ত, অর্থাৎ সভ্যতা তাকে বাঁচাতে পারল না, দিল মৃত্যু।

তার কারণ, আমরা এইমাত্র বলেছি, সভ্যতা আপন সৃষ্টিসম্ভারে ভারাক্রান্ত জীর্ণ বৃদ্ধের মত শিশুমানুষের ওপর চেপে বসেছে। যদিও তার দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ নিবদ্ধ, তথাপি এই বৃদ্ধের বোঝার চাপ বহন করার শক্তিসামর্থ অসহায় মানুষের নেই, অথবা তার মানস-প্রস্তুতিও সে তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। তাই,

---

more human existence, from bondage to freedom; another, to return to the womb, to nature, to certainly and security". Erich Fromm: The Sane Society.

সভ্যতার মুক্তিতে, তার বাঁচার প্রতিশ্রুতিতে, সে আর নিশ্চিন্ত হতে পারছে না, 'সর্বাঙ্গে লাগুক আকাশ' এই কামনার অতিশয়তায় স্থিতপ্রাজ্ঞ হয়ে পদচালনা করতে পারছে না। এই সভ্যতা যে জটিলতা সমস্যা ও বন্ধন সৃষ্টি করেছে, তার আঘাতে আঘাতে সে রুগ্ন, পক্বপত্র বৃদ্ধের ন্যায় আশাহীন। অথচ, মানুষ তো বৃদ্ধ হতে চায় না, চায় না অতি-প্রাজ্ঞের রসহীন শুষ্ক জীবন পেতে, চায় না সভ্যতার রোগক্লিষ্ট অন্তিম শয্যা। সেজন্যই বিরোধ, সেজন্যই সংকট। অবশ্য এ নয় যে, সভ্যতার মানবিক সম্পদ নিঃশেষিত; মানবপ্রেম আজও তার লক্ষ্যে বর্তমান, কিন্তু আদর্শ আর প্রত্যক্ষ কর্মের ব্যবধান এত দুস্তর যে শিশু-মানুষের পক্ষে তাতে আস্থাশীল থাকা কঠিন, যদিও সে জানে তারই মুক্তির স্বাক্ষর এই সভ্যতা।

অমল এই শিশু-মানুষ, যা প্রতিটি মানুষের মন, তার ভেতরকার মন। তার আনন্দ-বিচরণের পরিধি চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দেখে, নিয়ম-শাসনের দুর্ভেদ্য বাধা লক্ষ্য করে, এই মনই প্রতিনিয়ত মুক্তির আকূতিতে ছটফট করছে, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে। সে চায় না বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ হতে, অখণ্ড অবসরের মধ্যে অপ্রতিহত খেলা শুধু খেলার আনন্দে সে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে চায়। অথচ, আমরা অর্থাৎ সভ্য মানুষের সমাজ তা চাই না; আমরা চাই আমাদের বৃদ্ধ পত্রের জঞ্জাল শিশুর স্কন্ধে চাপিয়ে মুক্ত হতে। তার জন্য আমাদের কত আয়োজন, কত দুশ্চিন্তা, কত অনুনয় বিনয়, কত চোখ রাঙানি, কত বিচিত্র শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন! কিন্তু, তা সত্ত্বেও, সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়, কোন সুসমঞ্জস মীমাংসায় তা মিলিয়ে যায় না। কারণ, সমস্যা শুধুমাত্র শিক্ষাপদ্ধতির নয়, সভ্যতার। সংঘাত মুক্তি ও বন্ধনের, মানুষের নতুন জন্মের! সভ্যতার বিধানসম্মত এই নবজন্মের আগমনকে ত্বরান্বিত করার জন্য কী প্রাণান্তকর পরিশ্রম আমাদের, যেন এই মুহূর্তে শিশুর শিশুত্ব ঘুচে যায়। এ নয় যে, এই শিশু-মানুষকে আমরা ভালবাসি না, অত্যধিক ভালবাসি। ভালবাসি বলেই তার প্রতি আমাদের এই বিচার, শিশুর দৃষ্টিতে অবিচার। অমলের প্রতি মাধ ব

দত্তের ভালবাসাই অনভিপ্রেত অত্যাচারে পর্যবসিত, এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের চরম ট্র্যাজেডিই এই।

অমল-মাধব দত্ত সম্পর্কের যে ট্র্যাজেডি তা একক রবীন্দ্র-মানসের অভি-ব্যক্তির মধ্যেই আমরা পেতে পারি, যদি একই সঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথকে শিশু-মানুষ অমল এবং বৃদ্ধ সভ্যতার প্রতিনিধি শিক্ষক রূপে কল্পনা করি। যে মুক্তি অমলরূপে কবির কাম্য, নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা ও শৃঙ্খলার চক্রে আবদ্ধ শিক্ষকরূপে তিনি তা বিতরণে কুণ্ঠিত হ'বেন। এই দ্বৈত স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে বলেই সম্ভবত রবীন্দ্র-মানস মর্মবেদনায় বিক্ষুব্ধ হয়েছে বেশি।

যাই হোক, অমল শুধু শিশু-মানুষেরই মন নয়, প্রতিটি মানুষের মন। কারণ, মানুষ তার সভ্যতার অহঙ্কার সত্বেও অন্যান্য প্রাণীর মতই অসহায়, এবং অধিকতর সত্য অর্থে বন্দী। তফাৎ শুধু এই, জীবজন্তুর অসহায়তা ও বন্ধন প্রকৃতির কাছে, আর মানুষের—সামাজিক বিধিবিধানের কাছে, সভ্যতার কাছে অর্থাৎ নিজেরই কাছে। এই সভ্যতার বিরুদ্ধে কোন শিশু-মানুষের, কোন মানুষেরই কোন বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই; যেমন মাধব দত্তর বিরুদ্ধে অমলের প্রকৃতই কোন ক্রোধ বা অভিযোগ নেই। কিন্তু, শিশু-মানুষের চোখ থেকে আকাশের সমস্ত সৌন্দর্য, ভোরের সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যার সূর্যাস্তের চেতনাও যেমন তার বাবা-মা মুছে নেন তাকে বিজ্ঞ-শিশু বানানোর তাগিদে, মাধব দত্তও তেমনই অমলের আকাশ কেড়ে নিয়েছে ভালবাসার অন্ধতায়। সেজন্য একদিক থেকে মাধব দত্তই অমলের সব চেয়ে বড় শত্রু; তার ভালবাসাই অমলের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ।

সুতরাং, 'ডাকঘর'-এ আমরা মানবসভ্যতার ট্র্যাজেডির এক রূপ অভিব্যক্ত দেখতে পাই। এই ট্র্যাজেডি মানবসভ্যতা ও ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক, শিশু-মানুষ ও তার বাবা-মা-শিক্ষকের সম্পর্ক, এবং নাটকে অমল ও মাধব দত্তর সম্পর্ককে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্কের পরিপূর্ণ চিত্রে দেখতে পাচ্ছি, এক পক্ষ ভালবাসায় প্রেমে সহৃদয়, কিন্তু শাসনে কঠিন, আপন নীতি-

বোধের চেতনায় বলিষ্ঠ; অপর পক্ষ সুদূরের পিপাসায় চঞ্চল, কিন্তু অক্ষম অসহায় পঙ্গু। নাটকের পরিণতিতে অমলের মধ্য দিয়ে মুক্তি-পিপাসার মৃত্যুতে এটাই প্রমাণিত হলো, বর্তমান মানবসভ্যতার কোলে তথাকথিত প্রাজ্ঞজন ছাড়া আর কারও কোন আশ্রয় নেই, কোন মুক্তি নেই। সকলের সংগঠিত বন্ধন দশাই যেন বর্তমান সভ্যতার মর্মবাণী।

আমাদের মনে হয়, এইটেই 'ডাকঘর'-এর প্রধান বক্তব্য। সম্ভবত এই ট্র্যাজেডি গোপনে বিদ্রোহের একটি অঙ্কুরকে লালনও করছে। কেননা ট্র্যাজেডির বেদনায় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হলে পারস্পরিক সম্পর্কে একদিন ছেদ টানতে হয়, শিশু ও শিশুর বাবা-মার সম্পর্ক ক্রমে শিথিল থেকে শিথিলতর হয়, এবং একদিন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়; তেমনি, অসহায় মানুষও একদিন সভ্যতার আন্তর-সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; জন্মের নব রূপান্তরের সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হয়।

'ডাকঘর' রচনার পূর্ব মুহূর্তে যেমন, শৈশবেও সম্ভবত তেমনি, রবীন্দ্রনাথ অমলের সুতীব্র পিপাসায় তৃষিত ছিলেন; এবং সম্ভবত, তাঁর জীবন পরিবেশের সেই সেই স্তরের অভিভাবকবৃন্দ অগোচরে মাধব দত্তর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, তাঁদের ভালবাসা বাস্তব জীবনে নাটকের পরিণতিকে ডেকে আনেনি, বা সেইরূপ পরিণতির অবকাশ দীর্ঘকাল উন্মুক্ত করে রাখেনি। যদি রাখতো, তাহলে, সকলের অগোচরে, নাটকের চেয়েও ভয়াবহ এক ট্র্যাজেডি বাস্তব জীবনসম্পর্কের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে যেত, যার পরিমাপ যেমন দুঃসাধ্য তেমনি ক্ষতিপূরণও কল্পনাতীত।

'শিশু'

॥ এক ॥

রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্যসুন্দর কবিতাগুচ্ছ 'শিশু'-র অধিকাংশ কবিতার * অন্তরালে যে-মনটি সক্রিয়, তার আবেগ-সংবেদনায় কম্পিত আকাশের আলো ও মুক্তি-প্রার্থী স্বপ্ন পরিবেশ আলোচনা 'শিশু'-র রস উপভোগের পক্ষে অপরিহার্য ; এবং কোন্ আকূতি শত রহস্যের স্তর ভেদ করে কাব্য হয়ে প্রস্ফুটিত হয়, তারও আভাস এখানে নিহিত।

রবীন্দ্র-জীবনীতে দেখতে পাচ্ছি, '১৩০৯ সালের ভাদ্র মাস হইতে ১৩১০ এর ভাদ্র মাস পর্যন্ত কালটি রবীন্দ্রনাথের সংসার-জীবনের প্রথম অগ্নিপরীক্ষার যুগ। শান্তিনিকেতনে কবিপ্রিয়ার ব্যাধির সূত্রপাত, কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু ; মধ্যমা কন্যার ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ, তাহাকে লইয়া শান্তিনিকেতন, হাজারিবাগ, আলমোরা ঘোরাঘুরি ও অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া তাহার মৃত্যু—এই পর্বের ঘটনা। বিদ্যালয়েরও অসংখ্য সমস্যা, ব্যক্তিগত জীবনেও অর্থ-কৃচ্ছ্রতা।'†

---

* 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা ৬১ ; এদের মধ্যে ৩১টি কবিতা রবীন্দ্রনাথ পীড়িতা কন্যার রোগশয্যায় বসেই রচনা করেছেন। অন্য ৩০টি কবিতা প্রায় দুইযুগ ব্যাপী কাব্যসাধনায় তাঁর শিশু-মনের ক্ষণিক অনুরাগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১২৮৭, মাঘ-এ প্রকাশিত কবিতাও এই কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

বিভিন্ন সময়ের লেখা ৬১টি কবিতায় কবিমনের বিবিধ ভাবনা নানা রূপকাহিনীর সৃষ্টি করেছে; তথাপি, এই বিবিধ আশা আকাঙ্খা ও যন্ত্রনার অনুভব যে অপরিতৃপ্ত মানুষের, তাঁর মনের গভীরে একটিই শিশুর কান্না দুই যুগের অধিকাংশ কবিতায় স্পন্দিত হ'য়েছে। যে বিয়োগান্ত নাটকের সূচনা কবির জীবনে অন্য কোন নিয়তিলেখন দ্বারা বহুকাল পূর্ব্বেই স্বাক্ষরিত হ'য়েছে, ১৩০৯-১০এ আমরা কবির পারিবারিক জীবনে তারই চরমতম স্ফূর্তি (climax) দেখতে পাই।

† 'রবীন্দ্র-জীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা।

বস্তুত, তার কিছুকাল আগে থেকেই কবিজীবনে ব্যক্তিগত দায় ও দুঃখের সূত্রপাত। ১৩০৮ সালে কুষ্টিয়ায় বাণিজ্যের ইতি হলো, কবি শিলাইদহের বাসস্থান ত্যাগ করলেন ; 'নানা সাংসারিক সঙ্কটে বিজড়িত হইয়া' কবি 'অত্যন্ত পীড়িত চিত্তে' আছেন।—'কোনো রকমে মনের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া লেখাপড়ায় মন দিতে' চান, কিন্তু 'সংসার তাঁহাকে ছাড়ে না।' * এবং 'সংসার ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠা তুলনাহীন ; তাঁহার ন্যায় অতি স্নেহশীল পিতা কমই মেলে, তাঁহার ন্যায় ধৈর্যশীল স্বামীও দুর্লভ। তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গণ্ডিবদ্ধ পরিবারের মধ্যে তাঁহার সকল শক্তি নিঃশেষ করেন নাই, বাহিরের জগতের অসংখ্য বন্ধনে তিনি ধরা দিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিলেই বিবিধ কাজ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে। চিরদিনই দেখিয়াছি কাজকে তিনি নিন্দা করেন, কিন্তু কাজ না করিয়াও থাকিতে পারেন না ; অবসরের জন্য মন সর্বদাই চঞ্চল, আবার কাজ না থাকিলে অবসর বোঝা হইয়া উঠে ; রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই paradoxes হইতেছে তাঁহার বৈশিষ্ট্য।' †

বিদ্যালয়ের অসংখ্য সমস্যাগুলোর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করা যাক। ১৩০৮ সালে যথাবিধি অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যালয়—'আশ্রম'—প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু "নূতন বিদ্যালয়ে আদর্শের অস্পষ্টতা ও কর্মপ্রণালীর অনির্দিষ্টতার জন্য দৈনন্দিন জীবনে অচিরেই বিরোধ দেখা দিল। কল্পনার মেঘমণ্ডলে যাহাদিগকে অনন্যোসাধারণ দেবকল্প মনে হইয়াছিল, আজ বাস্তবের স্পর্শে তাহাদিগকে সামান্য বলিয়া মনে হইল।'†† অল্পকাল বাদেই—১৩০৯ সালের গোড়ার দিকে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় চিরকালের মত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে আশ্রম ত্যাগ করলেন ; অথচ, তিনিই বিদ্যালয়কে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রূপদান করেছিলেন।

* 'রবীন্দ্র-জীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।
† 'রবীন্দ্র-জীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।
†† 'রবীন্দ্র-জীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

তারও কিছুদিন বাদে শিবধন বিদ্যার্ণব ও রেবাচাঁদ আশ্রম ত্যাগ করলেন, তাঁদের স্থলে অন্যান্য শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। আশ্রমের কাজ অত্যন্ত শিথিলভাবে চলে। 'সমস্ত যেন খেলার মতো বোধ হইতেছে।' দু'চার মাস বাদে আরো শিক্ষক অনুপস্থিত, বিধিব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা, নতুন শিক্ষকের আগমন, ব্রাহ্ম-অব্রাহ্ম বিরোধ। আশ্রমের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিত হতে পারল না।

এইসব দুশ্চিন্তার সঙ্গে যখন কবিপ্রিয়া ও কন্যার অসুস্থতা ও মৃত্যু জড়িত হয়, তখন উদ্বেগটা বৈশাখী ঝড়ের ভয়াবহতা ও দুর্বারতা পায়, পায় দুর্দৈবের জ্বালা। এ থেকে পলায়ন বা মুক্তি বা অন্য আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষাই একমাত্র কাম্য, একমাত্র ভাবনা। তার উপর আবার অর্থাভাব দারুণ। 'ব্যাঙ্কে এখন আমার এক বৎসরের সঙ্গতি নাই, বৎসর শেষে বোধ হয় অনেক টাকা অনটন পড়িবে।' এই পটভূমিতে বোধ করি 'শিশু'-র অল্পকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছের ভাবসম্পদ উপলব্ধি করতে পারি। এখানে অসহায় মানুষের মনে অপার্থিব আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুলতা।

॥ দুই ॥

এই পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ কি ভূমিকা গ্রহণ করছেন, এবার দেখা যাক।

১৩০৮ থেকে ১৩১০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মন জুড়ে ছিল তাঁর পরিবার ও শান্তিনিকেতনের আশ্রম। দু'দিক থেকেই নানা মানসিক ব্যবধান, বিরোধ ও পরিণামে tragedy রচিত হয়ে চলছিল। যে শিলাইদহের প্রতি ছিল কবিচিত্তের আত্যন্তিক অনুরাগ, কবিপ্রিয়া মৃণালিনী দেবীর তার প্রতি কোন মিত্রতা ছিল না। কুষ্টিয়ার বাণিজ্যের পতনের সমসাময়িক ঘটনার সূত্র ধরে যদি আমরা অগ্রসর হই, তাহলে দেখতে পাই, কবির জীবনে পারিবারিক

বন্ধন ও দায়িত্ব যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি পর পর tragedyও ঘটছে। বিদ্যালয়েও তাই। ১৩০৮ সাল—তু'কন্যার বিবাহ; ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ১৩০৯ সাল—মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু; ব্রহ্মবান্ধব, শিবধন বিদ্যার্ণব, রেবাচাঁদ, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একে একে বিদ্যালয় ত্যাগ। ১৩১০ সাল—কন্যা রেণুকার মৃত্যু; 'শিশু'-র প্রকাশ।

এই পরিবেশে যে কথাটি সর্বাগ্রে মনে আসে তা হলো, রবীন্দ্রমানস যেন দায়িত্বের ভয়াবহ ভারে অত্যন্ত পীড়িত; অসুস্থ স্ত্রী, অসুস্থ কন্যা, নাবালক দু'টি পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে তিনি যেন ব্যতিব্যস্ত। পত্নীর মৃত্যুর পর অসুস্থ কন্যার সম্পূর্ণ দায়িত্ব-ভার একাকী রবীন্দ্রনাথের। জামাতা বিদেশে। শিশু সমী দাদা রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতন বোর্ডিং-এ। এবং সেই শান্তিনিকেতনেও ভয়াবহ কলহ, অশান্তি। যেন সমস্তই নিয়তি-লেখন, আর তিনি সর্বাঙ্গে প্রহার-ক্ষত নিয়ে এক অসহায় যোদ্ধা; শুধু আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা ও যন্ত্রণাকে নিয়েই এমনি করে জীবনের বিশ্রামহীন প্রহরগুলো কাটিয়ে দিতে হ'বে তাঁর।

দ্বিতীয়ত, এই সাংসারিক দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এক অসহনীয় অস্বস্তি বলেই তিনি যেন এখন, ঐ সময়ে, শিশু; মুক্তি চান, আশ্রয় চান, যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হয়ে জননীর আশ্রয় ভিক্ষা করছেন। অসহায় শিশু যেমন তার সমস্ত দায়িত্ব মায়ের হাতে তুলে দিয়ে ছুটির খেলায় চলে যায়, রবীন্দ্রনাথও যেন তেমনিভাবে মায়ের আশ্রয়ে খেলায় মত্ত হতে চান। এই শিশু নাবালক শিশু নয়; গুরু দায়িত্বের, উপর্যুপরি tragedy-র যন্ত্রণা থেকে মুক্তি-অভিলাষী এক ভাববাদী মানুষের মন। এই মন যেন ফিরে যেতে চায় শিশুর জীবনে, যেখানে সমুদ্র আছে, কিন্তু তার কাজ নুড়ি কুড়ানো, আর কোন দায়িত্বই তার নেই। ভীষণ ঝড়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার কাজ তার নয়। এই শিশুই যেন বলছে,

তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ

দুহাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে
আকাশ হবে আমাদের এই ছাদ !

তৃতীয়ত, অসহায় পুত্রকন্যাদের মনকেও হয়ত রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে বুঝতে চেয়েছিলেন ; গ্রন্থে শিশু-মনের অপরূপ জগতের ছবিও অনেক আছে, যা অভিনব, অতুলনীয়। সেই দিকটার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েই সম্ভবত কবি একটি পত্রে বলছেন, 'খোকাকে যখন আমরা সমস্ত রঙীন সুন্দর ও মধুর জিনিস দিয়ে খুশী করি ও খুশী হই তখনি বুঝিতে পারি আমাদের জন্য জগতটা কেন এমন রঙীন সুন্দর মধুর হয়েছে।.........ভালোবাসা না থাকলে সৌন্দর্যের কোন অর্থই থাকে না – মধুর হওয়া—মধুর করা প্রেমেরই চেষ্টা, স্নেহেরই আবেগ—ওটা শুদ্ধমাত্র সত্যের প্রয়োজনের বাইরে।.........ফুল তার বিপুল প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক শক্তিকে গোপন রেখে এমন কোমল এমন অপরূপ ভাবে ফুল হয়ে উঠছে কেন ? আমরা যখন নিজে ভালোবেসে মধুর হই—মাধুরী দিই—মাধুরী লাভ করি, তখনি তার তাৎপর্য বুঝতে পারি।'

'ডাকঘর' এবং 'শিশু' এই দু'টি গ্রন্থের কিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনা করলেই, মনে হয়, 'শিশু'-র পশ্চাদবর্তি কবিমানসটি পরিস্ফুট হবে। 'ডাকঘর'-এ কবিমন সাংসারিক দায়িত্ব থেকে কিছু দূরের মানুষের অসহায় মন, সুতরাং শিশুর মন। জননীর আশ্রয় না হলেও তার চলে ; কেন না, তার এমন দায়িত্ব নেই এমন কর্তব্যের বোঝা নেই যা জননীকে দিয়ে সে মুক্ত হতে পারে। জীবনের বন্ধনে, বলা যায় সভ্যতার বন্ধনে, শুধু সে আবদ্ধ; তা থেকে মুক্ত হয়ে সে শুধু খেলার মাঠ চায়, মুক্ত হাওয়া চায়। তাই 'ডাকঘর' তার সমস্ত কাব্যিক ঐশ্বর্য নিয়ে, সূক্ষ্ম রসানুভূতি নিয়ে, কিশোর মনকে টানে। যে আকুতি শিশু-মনের, যে প্রার্থনা তার, 'ডাকঘর'-এর মনেও সেই একই প্রাপ্তির তৃষ্ণা।

কিন্তু, 'শিশু'-র মন সাংসারিক দায়িত্বে নিমজ্জিত মানুষের মন। নিয়তির সঙ্গে সারাক্ষণ সংগ্রাম করে করে সর্বত্র পরাজয়ের মধ্যে সে চায়

তার শৈশবের জননীকে ; যেন তাঁর আশ্রয় পেলে সে পুনরায় ফিরে যেতে পারবে অবারিত মুক্ত হাওয়ায়, খেলার প্রাঙ্গণে। সেজন্য, 'শিশু' প্রধানত অসহায় মানবমনের পিপাসা নিবারণ করে। এই গ্রন্থের অনেক কবিতা কিশোরদের মনকে আকর্ষণ করে না, তাদের স্বপ্নালুতায় মিশে না। কিন্তু পরিণত মনে আনন্দের পুলক জাগায়। সম্ভবত, পরিণত মানব-মনের বেদনার সঙ্গে কোন একখানে ঐ কবিতাগুচ্ছের ভাবগত ঐক্য বা মিল আছে, হয়ত বা সংগোপনে বেদনায় ওরা এক।

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কি যে!
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি? বল মা সত্যি করে,
এমন লেখায় তবে বল দেখি কি হবে।

এমনি ধরণের প্রবীন বুদ্ধি মাঝে মাঝেই পাঠকচিত্তকে বিস্ময়াবিষ্ট করে। শিশুর 'পাকামি'-তে হঠাৎ কৌতুক জাগে।

'ডাকঘর' এবং 'শিশু' এই দুই গ্রন্থেই অসহায় মানুষের জীবন-ট্র্যাজডী সংগোপনে কাজ করছে। 'ডাকঘর'-এ এই ট্র্যাজডীর প্রকাশ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। 'শিশু'-তে তা স্পষ্ট নয় ; এখানকার কবিতাগুচ্ছে স্বপ্ন ও সাধের সঙ্গে ট্র্যজেডী অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মিশে আছে ; তাই হঠাৎ ধরা পড়ে না। কিন্তু, একটু অনুসন্ধান করলেই তা আত্মপ্রকাশ করে। দায়িত্ব থেকে খেলায় প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা যেমন সেখানে প্রবল, তেমনি মৃত্যুর করুণ রাগিণীও সেখানে মাঝে মাঝেই শোনা যায়। এই বিচিত্রভাব রূপায়ণে, ট্র্যজেডীকে খেলার মধ্যে আনন্দিত রাখায়, শিশুর সমগ্র মানসপটকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করায়, নিজের ভেতরকার 'বালকাণ্ড'-এর সঙ্গে পুনঃ পরিচিত হওয়ার প্রয়াসে, কবি-কৃতির যে অভিনবত্ব, প্রকাশ ভঙ্গীর যে চাতুর্য, চিত্রাশ্রয়ী রূপসৃষ্টির যে সৌন্দর্য এই কাব্যগ্রন্থটিতে প্রকাশিত হয়েছে, তা শুধু বিরল নয়, অতুল। দুঃখ এসেছে বিচিত্র

উপলব্ধির পথ বেয়ে, আনন্দ এসেছে উদ্বেগকে আশ্রয় করে, এবং মুক্তি পিপাসা অভিব্যক্ত হতে চেয়েছে উদ্বেগের ডানা ভর করে। রূপসৃষ্টির এই বিচিত্রতা সত্যই অপূর্ব।

কবিতাগুচ্ছে দু'টি অনুবাদ কবিতা রয়েছে। অনুবাদ কবিতার ধর্ম সম্পর্কে আজোবধি রবীন্দ্রনাথের কাছেই তরুণ কবিদের পাঠ নিতে হয়। কারণ এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথই তাঁদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। এ দু'টি কবিতার সঙ্গে আধুনিক যে কোন কবির অনুবাদ-কবিতা মিলিয়ে দেখলেই কবিতার পাঠক এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

'খাপছাড়া', 'সে', 'ছড়ার ছবি'

॥ এক ॥

'খাপছাড়া', 'সে', 'ছড়ার ছবি', এই তিনটি গ্রন্থ ১৩৪৩এর ভাদ্র মাস থেকে ১৩৪৪এর আশ্বিনের মধ্যে রচিত। তিনটি গ্রন্থই হাস্যরসের রচনা। সে-রস কতটা আপন বিশিষ্ট মধুরতায় পরিবেশিত হয়েছে, বা আদৌ হয়েছে কিনা, সে-বিচারের পূর্বে কবির মানস-পরিবেশের কিঞ্চিৎ সংবাদ নেওয়া যাক।

'রবীন্দ্র-জীবনী'-তে পাচ্ছি: কবি আজকাল সাধারণের নিকট দুর্লভ হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ তাহার অপবাদ করেন; কবি এই বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার অবসর পাইলেন। বক্তৃতা শেষে তিনি বলেন, 'সাহিত্যসাধনা বড় কঠোর সাধনা। রস-রচনায় প্রবৃত্ত হতে হলে, সাহিত্যের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করতে হলে, কঠিন আবরণের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। অঙ্কুর যেমন কঠিন আঁটির ভেতর থেকে আপনাকে সরস ক'রে, সুন্দর ক'রে ধরণীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি কঠোর সাধনা…করতে হবে, তবে তো সে-সাধনা সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে, পুষ্প-পল্লবে বিকশিত হবে।' (১৩৪৩, ৩রা শ্রাবণ: রবিবার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে)।

…শান্তিনিকেতনের দৈনিন্দন অবস্থা অত্যন্ত বাস্তব। কবির কাছে সকলের দ্বার মুক্ত, প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে অভাব, অভিযোগ, ত্রুটি লইয়া সরাসরি হাজির হইতে পারিতেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন এখন বড় হইয়া গিয়াছে, বহু বিভাগে বহু কর্তা, সুষ্ঠুভাবে কর্মপরিচালনার জন্য ও ভবিষ্যতে অবাঞ্ছিতদের উপদ্রব হইতে বিশ্বভারতীকে রক্ষা করিবার জন্য এই সময় বিশ্বভারতীর কন্‌স্টি-টিউসন্ বা বিধানপত্রের…পরিবর্তন সাধিত হয়।

নূতন ব্যবস্থায় পুরাতন অধ্যাপকমণ্ডলীর স্থান বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া শাসনভার বহুল পরিমাণে গিয়া বর্তাইল মুষ্টিমেয় লোকের উপর। এ-আদর্শে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পুরাতন ট্রেডিসন ও নূতন

পরিস্থিতির সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহাই ছিল সেদিনের প্রশ্ন। কবি ভাল করিয়া জানিতেন, দায়িত্ব দিয়া সম্মান দিয়া কর্মীদের নিকট হইতে যে-কাজ পাওয়া যায়, তাহা কেবলমাত্র বর্ধিত হারে বেতন দিলে পাওয়া যায় না। অথচ সময়ের পরিবর্তনের নূতন ব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজন। তাই কবি একদিন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের আহ্বান করিয়া যে ভাষণ দিলেন তাহাতে কবির এই দোটানা মনের ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে।

যাহাই হউক, কবি নূতন কন্‌স্টিটিউসনের সমর্থনকল্পে বলিতেছেন, 'ঢিলেমির প্রশ্রয় ঘটেছিল ডিমোক্রেসির নামে। আমরা পরের শাসনে বাঁধা কাজ চালাতে পারি, কিন্তু নিজের প্রবর্তনায় পারিনে। এই কারণে আমাদের এখানে উচ্ছৃঙ্খলতা এসেছিল। ...তাই এখানে চারদিকে পরস্পর সম্বন্ধের উদারতার মাঝখানে কর্মচালনায় কর্তৃত্বপদ সৃষ্টি করতে হয়েছে।' এইভাবে নূতনকে সমর্থন করিয়া কবি পুরাতনের ভাবটিকে রক্ষা করিবার আশায় অধ্যাপকগণকে তাহার চারিপাশে কেন্দ্রিত হইবার জন্য অসহায়ভাবে আহ্বান করিতেছেন।

'রবীন্দ্র জীবনী'-তে আরও পাচ্ছি : রবীন্দ্রনাথের জীবনে সবটা কাব্যও নহে কর্মও নহে। অত্যন্ত জটিল মনস্তত্ত্ব ও ভাবনাপূর্ণ কবিতা লেখার মাঝে মাঝে মন সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন রচনায় আপনাকে ভাসাইয়া দিতে চায়,— বাণীদান ও গুরুগম্ভীর কর্মসাধন—তাহারই ফাঁকে ফাঁকে হাসির পাথেয় ক্ষণে ক্ষণে, জীবন সরল হয়, মধুর হয়—সকল পার্থিব প্রতিকূলতার মাঝে মাঝে পাওয়া এইসব পুরস্কার। 'খাপছাড়া', 'সে', 'প্রহাসিনী', 'ছড়ার ছবি', 'ছড়া', 'গল্পসল্প'—সেই মুক্তিকামী মনের সৃষ্টি ; অবচেতন মনের কৌতুক দেখিবার জন্য আপনাকে সহজ করিয়া দেন ; রিল্যাক্‌সেসন, রিলিফ না থাকিলে সৃষ্টির পূর্ণতা হয় না।

॥ দুই ॥

ঐ উদ্ধৃতাংশগুলো আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যায়, কবির মানস-পরিবেশ সার্থক রূপসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল ছিল না। কবির অন্তর-জীবন নানাবিধ দ্বন্দ্ব, সংশয়, আত্মবিশ্বাসের অভাব, সন্দেহ, ক্ষোভ এবং বৈপরীত্যে বিদীর্ণ। তাতে যন্ত্রণা বাড়ে, কিন্তু ঐ ব্যক্তিগত দুঃখযন্ত্রণাকে শিল্পের মাধ্যমে সর্বজনীন করার ক্ষমতা অবলুপ্ত না হলেও অনেকটা হ্রাস পায়। ফলে, শিল্পগুণের অবনতি।

দু'তিনটি ঘটনা কবির ঐ বিপর্যস্ত মানস-পরিবেশের জন্য দায়ী। প্রথমত শান্তিনিকেতনের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা। 'বহু বিভাগে বহু কর্তা' 'অবাঞ্ছিতদের উপদ্রব হইতে বিশ্বভারতীকে রক্ষা করিবার জন্য' 'কর্তৃত্বপদ' 'মুষ্টিমেয় লোকের উপর' 'বর্তাইল'—ইত্যাদি বিশৃঙ্খলার ব্যাপকতার প্রতি যেমন ইঙ্গিত করছে, তেমনি কবি 'অসহায়ভাবে আহ্বান করিতেছেন' ইত্যাদিতে সমস্যার গুরুত্ব পরিস্ফুট। কবিমন যে আদৌ সুস্থির ছিল না, ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ, তা বলাই বাহুল্য। শান্তিনিকেতনের পূর্বআদর্শ ক্ষুণ্ণ করেও নিয়মশৃঙ্খলার জন্য এ-সময়ে কর্মী এবং অধ্যাপকদের অধিকার (হয়ত বা সম্মানও) হরণ করা হয়। সম্ভবত অবস্থার পীড়নে বাধ্য হয়েই রবীন্দ্রনাথকে এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু তাঁর সংবেদনশীল চিত্ত এতে ক্ষুণ্ণই হয়েছে,—এ অনুমান নিরর্থক নয়। মহৎ সৃষ্টির পক্ষে সর্বপ্রধান প্রতিকূলতা ঐ দিক থেকেই এসেছে।

তাছাড়া, এ সময়টায় দেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বাঁটোয়ারা নিয়ে প্রবল উত্তেজনা। সে উত্তেজনা কবির উপরও লাঞ্ছনার ঝড় নিয়ে আসে। এক শ্রেণীর মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক কবির উপর অশোভন অহেতুক আক্রমণ চালান, মুসলিম সাহিত্য-পত্রাদিতে কবি ভীষণভাবে তিরস্কৃত হন। তাঁর সাহিত্যকেও সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয়। কবি-চিত্ত ক্ষোভে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

জীবন-পরিবেশের বাইরের এই সব ঘটনা তাঁর মনের পৃথিবীকে অসম্ভব রকম

সঙ্কুচিত করে দেয়। স্বচ্ছন্দ বিহারের যেন আর অবকাশ নেই। তিনি বাইরে থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে দুর্লভদর্শন হয়ে পড়েন। এবং আশ্চর্য, দুর্লভদর্শনের সপক্ষে যুক্তিও খুঁজে বেড়াচ্ছেন তখন। ফলে, মনে কেমন যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য, কেমন যেন একটা অনভ্যস্ত কৃত্রিম পরিবেশ অজ্ঞাতসারে সৃষ্ট হয়ে চলেছে। সেটা কবির নিকট অভিপ্রেত নয়, কিন্তু তাকে স্বীকার না করেও উপায় নেই।

মনের এরূপ অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় কবি যেন পলায়ন করতে চাইলেন, ঘরে বাইরের অপ্রীতিকর অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর কাছ থেকে, কর্মক্ষেত্রের প্রিয়-অপ্রিয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে ; এমন কি, নিজের কাছ থেকেও যেন তিনি পলায়ন করতে চাইলেন। যেন পলায়ন ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। কর্ম-পরিবেশ থেকে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যে পলায়ন সম্ভব হলো না, তা-ই সম্ভব হলো সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। কবি এক যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করলেন ; নিজের মনের চেহারাটি হাল্কারসের আবরণে ঢাকতে চাইলেন। সম্ভবত ঢাকলেনও, কিন্তু অন্য এক ব্যর্থতা এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল। ঐ সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হলো না।

কারণ, এই আবরণে আপনাকে আবৃত করা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, বাইরের পীড়ন একে অনিবার্য করে তুলেছিল। ফলে, কেমন যেন একটা কৃত্রিমতা তাঁর কবি-মানসে অনুপ্রবেশ করে, আর, কৃত্রিমতা সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল নয়, তা বলাই বাহুল্য। পলায়নী মনোভাব থেকে মহৎসৃষ্টি সম্ভব, এবং হয়ও, যদি তা ব্যঙ্গাত্মক বা হাল্কারসের সৃষ্টি না হয়। প্রমাণ 'ডাকঘর'। 'ডাকঘর' পলাতক মনেরই সৃষ্টি, কিন্তু সহৃদয়তায় উজ্জ্বল। কবির অন্তর-বেদনা সেখানে বিশ্বের বেদনাকে আত্মস্থ করে রসে গাঢ় হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে, তাঁর আত্মচেতনা, তাঁর অহং (আমি রবীন্দ্রনাথ, আমি বিশ্ব-ভারতীর কর্তা ইত্যাদি) তাঁকে অন্যপথে পরিচালিত করেছে। 'সে', 'খাপছাড়া' ইত্যাদির হাল্কারসের অন্তরালে আছে মনের কথা প্রকাশ করার অনিচ্ছা, মনের

যন্ত্রণা ঢাকবার প্রচেষ্টা, এত বেশি আত্মসচেতনতা যে নিজের যন্ত্রণাকে সর্বজনীন করতে না পারা। কর্মক্ষেত্রে যেমন কবি বেমানান হচ্ছেন, তাঁর সৃষ্টিও যেন তদ্রূপ বেমানান। মনে হয়, সহৃদয়তার অভাবই আলোচ্য গ্রন্থগুলোর সাহিত্যিক অসাফল্যের কারণ।

'খাপছাড়া', 'সে', 'ছড়ার ছবি' সম্ভবত কবির সাহিত্য-সাধনার দুর্ব্বলতম কীর্তি। কবির সৃষ্টির আনন্দে উদ্বেল গোপন মনের কোনো স্বাক্ষর কোনো গ্রন্থের পাতায় নেই। তাঁর অবচেতন মনের কোনো পরিচয় যদি এ-সময়কার কোনো কীর্তিতে পাওয়া যায় তো তা ছবিতে ; লেখায় কোনো গভীরতারই স্পর্শ নেই, কোনো সমৃদ্ধ সঞ্চয় নেই, কোনো বইতেই না। বরং ফাঁকে ফাঁকে বৃদ্ধের সমস্যায় কণ্টকিত উদ্বিগ্ন মন এবং পাকা হাতের পরিণত ঢং-এর রচনা কাহিনী ও কবিতাগুলোকে বিরল করে রেখেছে। মনে হয়, কবির সতর্ক হস্তের লেখনীই এর মূলে। এ রচনায় আনন্দের খেলার কোন পরিচয় নেই, সেজন্য হাল্কা রসে স্বর্যের হাসির প্রসন্নতা কোথাও নেই।

রবীন্দ্র-জীবনীকারের উক্তি—কবি 'আপনাকে সহজ করিয়া দেন'—তাই আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। সহজ মনের সানন্দ স্পর্শ আমরা কোথাও পাইনি। কবি যেন নিজেকে জটিল করেই রেখেছেন। তাঁর চিত্ত সে-সময়কার পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতায় এমন বন্ধ ছিল যে সম্ভবত মুক্তির কোনো পথ ছিল না। সেই মুক্তির অভাবই বই-এর পাতায় কৃত্রিমতার স্বাদ এনে দিয়েছে। কোথাও সহজ স্বচ্ছন্দ গতি নেই। যেটুকু হাল্কারস বা তরলতা বর্ত্তমান, তা কবির সাহিত্য-কীর্তিকে কোনো ভাবেই উজ্জ্বল করে না।

'খাপছাড়া'-য় দু' তিনটি সার্থক কবিতা আছে। 'সে' সার্থক এমন কি মহৎ সৃষ্টি হতে পারত, কিন্তু কবির মানসিক মুক্তি অসম্ভব ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থই হলো। 'ছড়ার ছবি' সম্পূর্ণ অসার্থক রচনা। প্রায় পনের বছর পরের রচনা 'ছড়া'ও তেমনি অস্বচ্ছন্দ। একটিও সুন্দর কবিতা নেই।

'খাপছাড়া'-য় কবি বলেছেন,

সহজ কথা আমায় লিখতে কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।
লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।

কবি হয়ত বিনয় করেই মুখবন্ধ হিসেবে এ-কবিতাটি লিখেছেন, কিন্তু কবিতার কথা কয়টি তাঁর নিজের রচনা সম্পর্কে নির্মমভাবে সত্য। কঠিন লেখায় রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়, কিন্তু যা-তা লেখায় নিজেকে বিস্মৃত হয়ে নিরর্থক কথার আনন্দে মত্ত হওয়ায়, যা-তা-কে রসের মাধুর্যে সরস করার খেলায় তিনি ত্রৈলোক্যনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় প্রভৃতির নিকট একপ্রকার শিশু। 'ডাকঘর', 'বিসর্জ্জন', এমন কি 'মুকুট' বাংলাদেশের অন্য কিশোর-সাহিত্যিকের লেখার ক্ষমতা ছিল না, সে প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু, খাপছাড়া লেখায় 'খাপছাড়া'-র অনেক আগেই এ দেশের অন্য সাহিত্যিকেরা যথেষ্ট কুশলতা প্রদর্শন করেছেন।

রাজশেখর বসুকে বইটি উৎসর্গ করে তিনি লিখেছেন,

যদি দেখ খোলসটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের
যদি দেখ চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের······

ইত্যাদি। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, বৃদ্ধের খোলসটা কোথাও খসেনি। তাঁর বক্তব্য যেমন সফলতা পায়নি, তেমনি প্রলাপও হয়নি। ভূমিকার শেষ লাইনে বলেছেন, 'ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা', কিন্তু, এ লাইনটি ছাড়া

আর কোথায়ও ভোজবাজির সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে, সহৃদয় কিশোর বা প্রবীণ পাঠকের চিত্ত কবিতা-পাঠে সরস সজীব হয় না। গ্রন্থে যে দু'একটি সার্থক কবিতা আছে, যেমন,

খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার
ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার ;
চিনি কম পড়ে বটে পায়সে
স্বামী তবু চোখ বুজে খায় সে—
যা পায় তাহাই মুখে তোলে তার,
দোষ দিতে মুখ নাহি খোলে তার।

অথবা—

মন উড়ুউড়ু, চোখ ঢুলুঢুলু
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো
ছন্দটা নির্বাঁধুনিক।
পাঠকেরা বলে, 'এ তো নয় সোজা
বুঝি কি বুঝিলে যায় না সে বোঝা।'
কবি বলে তার কারণ আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক।

এদের সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে, এগুলো কতটা কিশোর-মানসের উপযোগী। অবশ্য, অত্যন্ত কম কবিতাই এদের মত এতটা সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে দীপ্ত। বাকীগুলো অত্যন্ত আড়ষ্ট। যদি ধরা যায় যে, এ বই কিশোরদের জন্য নয়, তাহলেও এর সার্থকতা বড় একটা থাকে না, কারণ, অতিরিক্ত বিবৃতি বা ফিরিস্তির দোষে প্রায় সব কবিতাই দুষ্ট। 'ছড়ার ছবি' ছেলেদের জন্য লেখা, কিন্তু কাব্য-সৌন্দর্যের দিক থেকে সুন্দরের দাবী এর টেকে না, রচনা অপটু। অনায়াস-পটুত্বের ছাপ কোথায়ও নেই।

॥ তিন ॥

'সে', 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি'-রচনাগুলিকে আরো স্পষ্ট করে সঙ্গের ছবিগুলি। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত মানব-মানবীর ছবিগুলির প্রায় প্রত্যেকটির মুখে অজস্র দাগ, যেন মুখগুলির অন্তর্নিহিত চেহারা এই দাগের সাহায্যে ঢেকে রাখবার কোন চেতনশীল বা অবচেতন মন শিল্পীর মধ্যে কাজ করেছে। এই দাগের আবরণটি যদি প্রতি ছবি থেকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হতো, দেখা যেতো অনেক-ক'টি মুখ হিংস্র বিভৎস এবং কঠিন। কবি রবীন্দ্রনাথের সহজাত মানবীয় কোমলতা এ-সব ছবির প্রাণস্বরূপ নয়। যে উষ্মা ব্যঙ্গ ও বিতৃষ্ণা বই তিনটিতে, বিশেষ করে 'ছড়া ও ছবি'-র কয়েকটি কবিতায় স্পষ্ট হয়েছে, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছবি-তে যেন আরো স্পষ্ট, অধিকতরো ভয়াবহ হয়েছে। ছবিতে কথায় কবিগুরুর জীবনে এমত অন্ধকারের আধিপত্য অল্প কয়েক-দিন মাত্র ঘটেছে। তারপর চিরন্তনী স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকেই আবার আমরা দীর্ঘদিন প্রত্যক্ষ করেছি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা এবং তাঁর কিশোর-সাহিত্য-রচনার পটভূমিকায় 'সে', 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি'-র তাৎপর্য তাই অকিঞ্চিৎকর মুহূর্তের দুঃস্বপ্নের মতোই।

'ছুটির পড়া'

১৯০৮ (বাংলা ১৩১৬) সাল-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-এর সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-শিক্ষার পটভূমিকায় তাঁর প্রথম বই 'ছুটির পড়া' প্রকাশ করেন। সমকালীন কয়েক বৎসরের বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস স্মরণে রাখলে এ-সময় এ-ধরণের পুস্তক প্রকাশের তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ হবে। লর্ড কার্জন বাংলা দেশে আসার পর রবীন্দ্রনাথ 'কথা'-র কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন এবং কবিতার মাধ্যমে রক্তক্ষয়ী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান জানান। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, উপরন্তু ছিলেন সৃষ্টিধর্মী কবি এবং একটি শিক্ষায়তনের কর্ণধার, 'কথা'-র বিপ্লবী আহ্বানকেই তিনি একমাত্র কর্তব্য মনে করেননি। তাঁকে সমস্যার ও সমাধান চিন্তার আরো অনেক গভীরে যাত্রা করতে হ'য়েছিলো, পরাধীনতার সঙ্গে অশিক্ষা এবং কুশিক্ষা কিভাবে কতখানি জড়িয়ে থাকে সে সম্পর্কে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের তুলনায় অনেক বেশী ভাবতে হ'য়েছিলো,' এবং 'ছুটির পড়া' এই পরিণত চিন্তার ফসল।

মনে হয়, এই একটি শিক্ষাপুস্তকের রচনায়, রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রথার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পাঠ্য পুস্তকটিকে তিনি নিম্নোক্ত বিভাগগুলিতে ভাগ করেছিলেন :

কবিতা—	৬	বড় গল্প—	১
বিজ্ঞান—	৪	হাসির গল্প—	১
ঐতিহাসিক কাহিনী—	৭	ভ্রমণ কাহিনী—	১
		মোট রচনা	=২০

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের দিকে আকর্ষণ করার মন সংকলনে প্রথম-দৃষ্টিপাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিহাসের প্রতি আসক্তি ১৯০৮ সাল-এ কোন নতুন অনুভব মনে না হ'লেও, বিজ্ঞানের প্রতি এই সঙ্গত পক্ষপাত সে-কালে নিশ্চয় আমাদের দেশের পাঠ্যপুস্তকে সুলভ ছিল না। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ-এর কাজ করেছেন। স্বাধীনতার সঙ্গে শিক্ষার যে সহজাত সম্পর্ক তিনি এ-সময় উপলব্ধি করেছিলেন, আমরা আজ অনুভব করি যে, শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান-চর্চারও তেমনি একটি গভীর আত্মীয়তা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম সত্যে স্থির না থেকে সে সময়েই আরো অগ্রসর হ'য়েছিলেন এবং স্পষ্টই দ্বিতীয় সত্যে পৌঁছেছিলেন। আরো লক্ষ্যনীয়, তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি যেন একটি বৃহৎ প্রবন্ধের অংশ, পরস্পর একসূত্রে বাঁধা। সূর্য, পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক, সূর্যের আলো এবং সূর্যের তাপ সম্পর্কে ছাত্রদের মনে একটি প্রাথমিক ধারণার সঞ্চার করাই শিক্ষাব্রতী লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। লেখাগুলিকে পাশাপাশি না সাজিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন পাঠে ছাত্রদের মনে ক্লান্তি না আসে। মাঝখানে কবিতা, গল্প বা ইতিহাস, তার পর আবার সূর্যের জগতে ফিরে আসা, নতুন উৎসাহ, নতুন আবিষ্কারের নেশা নিয়ে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা ও দর্শনগুলিকে যতদূর সম্ভব সরলীকরণ করা হয়েছে, ভাবার প্রকাশে কোনরূপ জটিলতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি।

ঐতিহাসিক গল্প এবং কাহিনীগুলির নির্বাচনেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় রুচি ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। জর্জ ওয়াশিংটন, গুরু নানক, নেপোলিয়ন, আকবর, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি চরিত্রগুলি বিভিন্ন কাহিনীর ভেতর নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভীড় করেছে; কিন্তু একমাত্র নানক ছাড়া এঁদের কেউই নায়ক নন, পার্শ্বচরিত্র মাত্র। ইতিহাসের কাহিনীতে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথা, তাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও দৃঢ়তা রাজা-মহারাজাদের কাহিনীর সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান পেতে পারে, সেদিকে রবীন্দ্রনাথ বারেবারেই ছাত্র-পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইতিহাস যে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, সাধ

ও সংগ্রামকে আশ্রয় করেই যুগে যুগে এবং দেশেবিদেশে উজ্জীবিত ও উৎসাহিত হয়, 'ছুটীর পড়া'-য় রবীন্দ্রনাথ সেই সত্যের দিকেই পরাধীন বাংলার ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঋষির দৃষ্টি না থাকলে বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের প্রতি এত সযত্ন পক্ষপাত একটি পাঠ্যপুস্তকের রচনায় অন্ততঃ ১৯০৮ সাল-এ সম্ভব ছিল না।

'ছুটীর পড়া'-র অন্যতম আকর্ষণ একটি বড় গল্প 'মুকুট'। ইতিপূর্বে এই গল্পের প্রকাশ এবং তাৎপর্যের অনুসন্ধানে আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম, এবং তার ফলাফলও আমরা অন্য প্রবন্ধে বিস্তারিত জানিয়েছি। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা শুধু এ-কথাই বলতে পারি, ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ, কিশোরদের চোখে তার একটি স্পষ্ট ছবিই 'মুকুট'-এর কাহিনীতে প্রত্যক্ষ হয়। নিজ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সাবধানবাণী উচ্চারণ করার জন্যই হোক অথবা বঙ্গ-বিভাগের মুখোমুখি ভ্রাতৃবিরোধ এবং ভ্রাতৃবিচ্ছেদের পরিণাম চিন্তা করেই হোক, এই দীর্ঘ গল্পটিকে তিনি সংকলনে স্থান দিয়েছিলেন। যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা থেকে তিনি ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের কাহিনীগুলিকে একটি বিশেষ পরিকল্পনার অংশ করেছেন, 'মুকুট'-এর নির্বাচনও আমাদের মনে হয়, সেই চিন্তাধারার বাইরে নয়। শিক্ষাদানের প্রকৃত অর্থ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিতরণ, যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শিশু বা কিশোর 'মানুষ'-এ রূপান্তরিত হয়। বয়সে সকলেই বাড়ে, কিন্তু সবাই মানুষ হয় না। সূর্যের বিরাট মহিমার সঙ্গে ভ্রাতৃ-বিরোধের দুঃসহ পরিণামকে তাই তিনি একসঙ্গে মিলিয়েছেন, এবং এই ভয়াবহ কাহিনীর পথও যাতে কিশোর-ছাত্রদের ক্লান্ত অথবা গ্রাস না করে সেজন্য 'মুকুট' গল্পটিকেও তিনি দু'ভাগে ছড়িয়ে দিয়েছেন, মাঝখানে উদাত্ত এবং উদার প্রকৃতি এবং মানুষের অন্য কাহিনী।

কিন্তু এই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সঙ্গে, যে পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের মন এতক্ষণ বিজ্ঞানীর মন ছিল, 'ছুটীর পড়া'-র কবিতাগুচ্ছের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে অবশ্য বন্দী-জীবনের মুক্তি-স্বপ্ন আছে, শিশু বা কিশোরের চোখে মুক্ত

নীল আকাশের জন্য এক অদম্য আকাঙ্খা আছে; কিন্তু ১৯০৮ সাল-এ রবীন্দ্রনাথ-সংকলিত পাঠ্যপুস্তকটিতে বাংলা দেশের উদ্দেশ্যে একটি কবিতারও নিবেদন নেই, এমনকি 'কথা' পুস্তকের কোন কবিতা নেই। চারটি কবিতা মা-কে সম্বোধন করে লেখা। যেখানে মায়ের মন এবং অপরিণত শিশুর মন স্বপ্ন নিয়ে খেলা করে, সেখানে পরিণত কিশোর ছাত্রদের রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে ঘুরেফিরেই আহ্বান জানাচ্ছেন, এ প্রশ্নের সমাধান আমরা খুঁজেও পাই না। ছুটির দিনে, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, বনবাস, বীরপুরুষ, মাঝি, কাগজের নৌকা—এদের মধ্যে কয়েকটি কবিতা অনবদ্য, এবং সেই কারণেই সর্বজনপাঠ্য। কিন্তু আমাদের আপত্তি অন্যত্র। এই কবিতাগুচ্ছের নির্বাচনে যদি কোন পরিকল্পনা থাকে, তা হ'লো কিশোর ছাত্রদের মনে বারে বারেই 'মা' ডাকের গুঞ্জনটি নিয়ে আসা। কিন্তু মা-কে সামনে রেখে বৃষ্টির দিনে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দেওয়ার যে খেলা, তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের জীবনের যোগসূত্র কোথায়, যে ছাত্ররা সূর্যের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে সত্যকে জানবে, ভ্রাতৃবিরোধের ভয়াবহ পরিণাম উপলব্ধি করার বয়স যাদের হ'য়েছে। 'ছুটির পড়া' উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের জন্যই প্রকাশিত। শুধু উৎকৃষ্ট কবিতা নয়, পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খায় এমন কবিতাই তাই এই সংকলনের সঙ্গতি রক্ষা করত।

১৩১৬ সাল-এর রবীন্দ্রমানস খুঁজে আমরা এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইনি, কেন কবি তাঁর পাঠ্যপুস্তকে এমন একটি কবিতারও স্থান নির্দেশ ক'রলেন না, যা তাঁর তৎকালীন গভীর সামাজিক ভাবনাগুলিকে প্রতিফলিত করেছে? কেন পরাধীন বাংলার কিশোরদের মনকে একটিই স্বপ্নে, এবং যে স্বপ্ন মায়ের আঁচলের কুয়াশাকে আশ্রয় করে আকাশে হাত বাড়ায়, তিনি বর্ষা-ঋতুর অধিকতর অস্পষ্ট কুয়াশায় বারেবারেই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।* হয়তো সাহিত্যের শ্রেণী-নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ-এর বিচার ও ধারণায় এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আছে, সম্ভবতঃ

* অধিকাংশ কবিতাই বর্ষা-ঋতুর বর্ণনায় মুখর।

তিনি কিশোরমনে কবিতা ও গদ্যের কাজকে স্পষ্টই পৃথক মনে ক'রতেন। গদ্যের কাজ মনকে বিজ্ঞানী করা, বস্তু এবং ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে শিশু-মানুষের চিন্তাকে উদ্বোধিত করা; অপরপক্ষে, কবিতার কাজ তাকে স্বপ্নরাজ্যে হাত ধরে নিয়ে যাওয়া, বিজ্ঞানের বাইরে মানুষের ধ্যান ও ধারণায় অন্য যে-জ্ঞানের প্রয়োজন আছে সে-জ্ঞান বা দর্শন-এর অনুভবকে শিশু মানুষের চিন্তা ও চেতনায় ঘনীভূত করে তোলা;—যদি রবীন্দ্রমানসের এমন কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা আমাদের জানা থাকতো, আমাদের বুঝতে সহজ হ'তো, কেন বঙ্গভঙ্গের যন্ত্রণা এবং স্বাধীনতা অর্জনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা যা তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত একটি কাব্য-গ্রন্থের* মূল প্রেরণা, তাঁর পাঠ্যপুস্তকের একটি কবিতাতেও প্রতিফলিত হয় নি। কিন্তু 'কথা'-র অধিকাংশ রচনা তিনি কিশোরদের জন্যই একদা লিখেছিলেন, এবং কিশোর-চেতনাকে মনুষ্যত্ববোধ-এ পৌঁছে দিতে তখনো যে কবিতাই শ্রেষ্ঠ বাহন, এ অনুভব অন্ততঃ ১৩০৬ সন-এর রবীন্দ্রমানসে খুঁজে পেতে অধিক পরিশ্রম করতে হয় না।†

সমগ্র পরিকল্পনায় উপরোক্ত কবিতা নির্বাচনের অসঙ্গতি ছাড়া 'ছুটির পড়া'-য় আর কোথাও কোন শৈথিল্য নেই। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে প্রকাশিত এই একটি স্কুলপাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে এমনকি আজকের স্কুলপাঠ্য রচনাগুলিরও কী নিদারুণ পার্থক্য আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই! মনে হয় পঞ্চাশ বছরে আমরা কী ভীষণভাবেই না পিছিয়েছি। বিশেষ করে কিশোর মনের উপযোগী প্রবন্ধ-রচনাগুলির নির্বাচনে অপরিসীম দৈন্য ও অক্ষমতাই সর্বত্র, সকল শ্রেণীর স্কুলপাঠ্য রচনায় অদ্যাবধি আমাদের প্রত্যক্ষ হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত ঋষি-মনের কাজ না থাকলে একটি স্বাধীন-জাতিরও কী দুর্ভোগ হয়, আজকের বাংলা স্কুলপাঠ্য যে কোন সংকলন গ্রন্থই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

---

* কথা: প্রথম প্রকাশ ১৩০৬। ১৩১০-এ রবীন্দ্রনাথ-এর কিশোরপাঠ্য অন্যান্য কবিতার সংকলন 'শিশু' প্রকাশিত হয়। এ-বই থেকেই 'ছুটির পড়া'-র কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে। 'কথা' বই থেকে একটি কবিতাও পাঠ্যপুস্তকে গ্রহণ করা হয় নি।

† 'কথা ও কাহিনী' প্রবন্ধটিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

'ছুটির পড়া'-র সঙ্গে প্রায় দুই যুগের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সহজপাঠ' পুস্তকের রচনা করেন। এ-ছাড়া 'পাঠসঞ্চয়' ও 'পাঠপ্রচয়' তাঁর জীবিত কালে এবং 'সংকলিতা' (কবিতা সংকলন) মৃত্যুর পর প্রকাশিত হ'য়েছে। পরবর্তী সমস্ত সংকলনগুলির মধ্যে একমাত্র 'সহজপাঠ'-এ রবীন্দ্রনাথ মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বইটিকে ইতিপূর্বে আমরা সুদীর্ঘ আলোচনার বিষয় করেছি এবং একথাই জানিয়েছি যে, পাঠ্যপুস্তক হিসেবে সহজপাঠ* আমাদের তৃপ্তি দেয়নি, যদিও প্রথম খণ্ড 'সহজ পাঠ'-এ কয়েকটি অপরূপ কবিতা রয়েছে যা পরিণত মানুষের বোধে সুখস্বপ্নের মতই ক্রিয়াশীল। তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড 'সহজপাঠ'-এর প্রবন্ধগুলি † সুনির্বাচিত, এবং একমাত্র এ বই দু'টিতেই 'ছুটির পড়া'-র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং রুচিবোধের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সেই স্মরণীয় নাম, বাংলার কিশোর ছাত্র-সম্প্রদায় তাদের পাঠ্যপুস্তকের প্রসঙ্গে যে নামকে সকল সময়েই শ্রদ্ধার সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উচ্চারণ করবে।

* 'সহজপাঠ'; প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

† তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডের অধিকাংশ গদ্য রচনাই রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়।

'সহজপাঠ'

॥ এক ॥

রবীন্দ্র-প্রতিভা যেমন বিষয়বস্তুর পরিচয়ে মনকে নানাভাবে আলোকিত করে, তেমনি বিষয়ের বিশ্লেষণে নতুন নতুন সমস্যারও সৃষ্টি করে। তাই উপভোগের সঙ্গে আসে প্রশ্ন, আস্বাদের সঙ্গে চিন্তা। শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট রবীন্দ্র রচনাবলীও রবীন্দ্রসাহিত্যের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের বাইরে নয়। এখানেও তাঁর অবদান পরিমাণে যেমন বিপুল, গুণেও তেমনি বিস্ময়কর; ভাবনায় যেমন পরিব্যাপ্ত, রূপায়ণে তেমনি অভিনব। কিন্তু তা সত্বেও, এই সাহিত্যের আস্বাদনও স্বাভাবিকভাবেই মনে নানা প্রশ্ন নিয়ে আসে, যেগুলো বিষয়ের গুরুত্বের জন্যই আলোচিত হওয়ার স্পর্ধা রাখে; শিশুর মানস-সংগঠন, তার বিকাশ, বিকাশের বিশিষ্ট ধারা ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর রচনার মূল্যায়ণ বিশেষভাবে জড়িত। বর্তমান প্রবন্ধে শিশু-মনের বিশেষ প্রকরণের দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হবে, 'সহজপাঠ'-কে ভিত্তি করে। বলে রাখা ভাল, 'সহজপাঠ'-এর যদিও চারিটি ভাগ রয়েছে, তথাপি আমাদের আলোচনা 'সহজপাঠ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ওপরই মুখ্যত সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ, শিশু-শিক্ষার গোড়ার দিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে এই দুইটি ভাগের গুরুত্ব অত্যাধিক।

॥ দুই ॥

শিশুর জগৎ আর বড়োদের জগৎ যেন দুটো পৃথক রং—সাদা আর কালো। একটি বিস্ময়ে আনন্দে মায়ায় কৌতূহলে স্বপ্নে কল্পনায় রঙীন, বিচিত্র বর্ণের সমারোহ সেখানে, বিচিত্র রূপের আসা-যাওয়া—এইটি শিশুর; আর একটি রূঢ়

সত্যের প্রাকাশে কঠিন, দায়িত্বের প্রয়োজনের নিরন্তর তাগিদে ভীরু, পাখা মেলবার সাহস তার নেই—এইটি বড়োদের। এই দুই জগতের মানসপরিমণ্ডল সম্পূর্ণ পৃথক, সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। শিশুর বিস্ময় দিয়ে বড়োদের জগৎকে কদাপি জানা যাবে না, যেমন বড়োদের প্রাজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে শিশুর মনোরাজ্যে বিচরণ কখনও সম্ভব নয়। শিশু-জগতের বর্ণালী-বৈশিষ্ট্য বড়োদের উপলব্ধিতে কখনও পরিষ্কার ধরা যায় না, যাবেও না। শিশু-পৃথিবীর কোন সুমীমাংসিত বিশ্ববোধ নেই, কিন্তু তীক্ষ্ণ বস্তুবোধ রয়েছে, এবং এই বোধ বড়োদের বোধ থেকে স্বতন্ত্র ; কোন এক জায়গায় এসে মিলে না।

শিশু-পৃথিবীতে যার মূল্য অবিসংবাদিত বা যা পূর্ণ মহিমায় স্বীকৃত, বড়োদের পৃথিবীতে তার কোন মূল্যই নেই। যা স্নেহ-মমতায় আদরেসোহাগে বিশেষ, বড়োদের নিকট তার কোন মর্যাদাই নেই, মাটির ঢেলার মত মূল্যহীন। যেমন পুতুল। শিশুর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ পুতুল কখনও বড়োদের জগতে সমাদৃত হয় না, অথবা সেখানে এর কোন স্বীকৃতিও নেই ; স্বীকৃতি পায় তখই যখন শিশুকে কান্নায় ভাসিয়ে বড়োরা পুতুল ছিনিয়ে নেয়। এই পুতুলকে নিয়ে শিশুর সোহাগের অন্ত নেই, অথচ, অন্য সময়ে, নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে একে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলতে তার একটু কুণ্ঠা নেই, একটু যন্ত্রণা নেই। কেননা, প্রাণহীন প্রাণবস্তের সীমা নির্ধারণ করা তার পক্ষে তখনও সম্ভব হয়নি। সমস্ত সম্ভব-অসম্ভবের ভেদাভেদ বিলোপ করে, বড়োদের সমস্ত অবাস্তবকে বাস্তবায়িত ক'রে, তার সমস্ত ভাব-কল্পনাকে একই সময়ে অস্তিত্বশীল করে, সে এক অপূর্ব জগৎ সৃষ্টি করে ; এবং সৃষ্টির তন্ময়তায় সারাদিন থাকে বিভোর হয়ে। আমরা বড়োরা, এই তন্ময়তার স্বাদ গ্রহণে অক্ষম হয়ে আমাদের বোধ বুদ্ধি অনুচিত-উচিতের মানদণ্ড দিয়ে বিচার ক'রে শিশুর জগৎকে বলি,—শুধু খেলা, খেলার জগৎ। আমাদের চোখে সে জগৎ হালকা হাওয়ার মত, দায়িত্বহীন ; গুরুত্বহীন, বর্ণ বিচিত্র, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু, শিশুর চোখে ? বলা বাহুল্য, তার মূল্যায়ন অন্যরূপ। তার প্রয়ো-

জনের বিচার আর এক রকম। তার কাছে খেলা এবং খেলার জগৎই একমাত্র জগৎ—সত্যতার নির্দিষ্টতার ঐকান্তিকতার দাবীতে তা বড়োদের জগৎ থেকে কোন অংশেই খাটো নয়। কারণ, যখন সে খেলায় বা খেলারূপ সৃষ্টিতে তন্ময়, তখন বড়োদের পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব তার কাছে নেই, বড়োদের কোন অনুশাসনের কোন মূল্য নেই, খেলার জগতের অংশীদার হ'তে পারে না বলে সেই মুহূর্তে সেই ক্ষণে বড়োদেরও কোন অস্তিত্ব নেই। তার জগৎ সার্বভৌম, শিশু ছাড়া আর কারো কর্তৃত্ব সেখানে শুধু অবাঞ্ছিত নয়, অসহ্য। ফরাসী শিশু-মনস্তাত্ত্বিক Piaget এ-কথাটাকে অত্যন্ত সুন্দর করে' প্রকাশ করে' বলেছেন, "Play is the only reality in which the child believes ; therefore reality itself is something a child likes to play with adults. অর্থাৎ, শিশুর নিকট খেলা-রূপ সত্যই একমাত্র সত্য ; সেজন্য, বাস্তবকে নিয়েও সে বড়োদের সঙ্গে শুধু খেলতেই চায়। বাস্তবও তার নিকট নিছক খেলারই সামগ্রী। তার জগতের সত্যতায় শিশু এত বেশী নিঃসন্দেহ, তার ঐশ্বর্যে এত বেশী অকুণ্ঠচিত্ত। এই জগতে বড়োদের হস্তক্ষেপ তাই সে কখনও সহ্য করতে পারে না, অক্ষম কান্নায় প্রতিবাদ জানায়।

কিন্তু, গড়ে' ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সে উপলব্ধি করে যে, তার জগৎ ছাড়াও আর একটা পৃথিবী আছে যেটা বড়োদের, যার সত্যতা তার জগতের সত্যতার চেয়ে ন্যূন নয় ; যেটাকে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, প্রয়োজনের গরজে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। সে এও উপলব্ধি করে যে, বড়োদের পৃথিবীতে তার কোনো স্বাধীনতা নেই, তার কল্পনার বল্গাহীন বিহার নেই ; পদে পদে বাধা, দায়িত্বের বোঝা। এই দুটো স্বতন্ত্র, প্রায় বিরুদ্ধবাদী, পৃথিবীর মধ্য দিয়েই শিশুকে অগ্রসর হতে হয় ; বস্তুর সত্তা ও স্বরূপও শিশু-মানসে ক্রমে রূপান্তরিত হতে থাকে। দেখা যায়, তার একলার রাজত্বে যে বস্তু সত্য, বড়োদের আসরে তার সত্যতা কিছুই নেই, সে নিজেও যেন সব সময় তার নিজস্ব জগতের বস্তু-সত্যকে মানতে পারে না। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, নিজের জগৎকে

সে কিছুতেই খর্ব করতে পারে না ; দুটো স্বতন্ত্র জগৎই সমান গুরুত্বে তার মানসপটে অস্তিত্বশীল থাকে। দু'য়েরই সমান অধিকার, সমান স্বীকৃতি।

তারপরেও দিন যায়। ক্রমে, শিশু উপলব্ধি করে, বড়োদের জগৎ যেন আয়তনে, গুরুত্বে, বিপুলতায় অধিকতর সত্য হয়ে উঠছে। যেন তার খেলার জগৎ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। বড়োদের জগতের সঙ্গে অধিকতর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায়, এবং পরিণামে সুস্পষ্ট মানস-রূপান্তর হওয়ায়, তার নিজস্ব পৃথিবীকেও সে যেন বড়োদের দৃষ্টিতে দেখতে পায় ; মনে হয়, সবই শুধু খেলা, অকারণ, অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু, একদিকে যেমন এই চেতনা বিকশিত হ'তে থাকে, তেমনি, অপর দিকে, শিশুও এই পরাজয়কে সহজে মেনে নেয় না, প্রতিবাদ জানায়, বিদ্রোহ করে, খেলার অকারণতাকে জীবনে দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা করে। এ অবস্থায় Koffka বলেন, 'the stimulus to play may even be heightened by the fact that the play-world is devoid of all responsibilities.' অর্থাৎ, এ অবস্থায় শিশুর খেলার তাগিদ যেন আরও বেড়ে যায়। দেখা যায়, কর্তব্যজ্ঞানে যে কাজ শিশু কিছুতেই করবে না, কিছুতেই মনোযোগ দেবে না, খেলাচ্ছলে সে কাজ সে দুর্বার অধ্যবসায়ের সঙ্গে করবে। খেলার জগতের স্বপ্ন-মায়া-অধ্যাস এত শক্তিশালী, এত চিত্তহারী। *

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শিশু নিজের গোচরে অথবা অগোচরে, আপনা থেকেই যতটা শিখবার শেখে, বড়োদের পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান আয়ত্ত করবার করে, অর্থাৎ তার খেলার জগতের সত্যতা বিনষ্ট না করে' যতটা ব্যবহারিক জ্ঞান সঞ্চয়ন সম্ভব ততটা সে করেই। কিন্তু যখন তাকে একটা বাঁধাধরা শিক্ষাব্যবস্থার মুখোমুখী হ'তে হয়, বুঝতে পারে যে, কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম তার উপর আরোপিত হচ্ছে, সময়ের, বাক্যের, কিছুটা বা যুক্তির

---

* উদ্ধৃতি দু'টি এবং এ অধ্যায়ের যুক্তির কাঠামো মুখ্যত K. Koffka-র 'The Growth of the Mind' গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অভ্যাস ও নির্দিষ্টতা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে; তখন তাঁর খেলার সীমাহীন অধিকার অতর্কিতে আক্রান্ত হচ্ছে—এটা ভাবা তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আর এরকম ভাবে বলেই তো তার বিদ্রোহ। সেজন্য শিক্ষার ব্যাপারটাকে যতটা খেলার মত কর্তব্যবোধহীন, অকারণ, আনন্দসর্বস্ব করা যায়, ততই সেটা শিশু-মানসের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় বলে মনস্তাত্ত্বিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। কারণ, গুরুতর কর্মভার গ্রহণের প্রস্তুতিস্বরূপ তাঁরা খেলাকে জৈবিক দিক থেকেও অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বলে মনে করেন। *

শৈশব শিক্ষার কাল। বলা চলে, শৈশবকে যতটা সম্ভব বেশি দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, শিশু ততটা বেশি শেখে। কিন্তু, তার ভবিষ্যতের ভাবনায় উদ্বেল হয়ে বড়োদের পক্ষে শিশুকে দীর্ঘকাল তার খেলার জগতে ছেড়ে রাখা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে বড়োদের জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এই সরিয়ে আনার কাজটি যত সহজ, আনন্দউদ্ভাস, ক্রীড়াচঞ্চল হয়, শিশুর দিক থেকে ততই মঙ্গল। শিশুশিক্ষার গোড়ার কথা এই সত্যে নিহিত। আমাদের মনে হয়, যে শিশু ছোটর জগৎ থেকে বড়োর জগতে রূপান্তরিত হওয়ার কাঠিন্য কম অনুভব করে, তার মানসপরিবেশই অপেক্ষাকৃত সুস্থ, সবল।

॥ তিন ॥

আমাদের প্রাক্-আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়, স্কুলে পাঠশালায়, শিশুর মানস-সংগঠনের দিকে, শিশুর মোহ-রঙীন জগতের দিকে, কোন দৃষ্টিপাত করা হতো না বলেই শিক্ষা বা লেখাপড়া তার নিকট একটা দুঃসহ বিভীষিকা বলে মনে হতো। ভয় তাকে আড়ষ্ট করে রাখত, কল্পনা পাখা মেলবার সাহস পেতো না, মন আনন্দের সন্ধান পেতো না। অথচ শিশুর পক্ষে তার স্বপ্নকল্পনার বিস্তার

* এই মন্তব্যটিও পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

না হলে চলে না ; বড়োদের পৃথিবীর গাম্ভীর্য ও শাসনসীমার বাইরে না যেতে পারলে তার চলে না। সেজন্ত, তার সর্বক্ষণের আকাঙ্খাই হ'লো ঐ পৃথিবীর, অভ্যস্ত অভিজ্ঞতার সীমা লঙ্ঘন করা ; যেখানে দায়িত্ব নেই, কিন্তু আনন্দ আছে ; কর্তব্যবোধের আড়ষ্টতা নেই, প্রাণের সহজ অভিব্যক্তি আছে।

রবীন্দ্রনাথ শিশু-মনের এই দিকটার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন, এবং তার প্রয়োজনের দাবী মেটাতে চেয়েছিলেন। 'সহজপাঠ'-এ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয়ে যেসব ছড়া দেওয়া হয়েছে, তার ইঙ্গিত বোধ করি সেদিকেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেদিক থেকে কতটা সার্থক হয়েছেন, তার বিচার আপাতত স্থগিত রেখে আমরা তাদের বিশেষত্ব আলোচনায় অগ্রসর হবো।

প্রথমত লক্ষ্যণীয় যে, অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণের সঙ্গে যে সব ছড়া কবিতা দেওয়া হয়েছে, তাতে বর্ণগুলির পুনরাবৃত্তি নেই। যথা,

ছোটো খোকা বলে অ আ,
শেখেনি সে কথা কওয়া।

অথবা, ম চালায় গোরু-গাড়ি,
ধান নিয়ে যায় বাড়ি।

অথবা, ক খ গ ঘ গান গেয়ে
জেলে ডিঙি চলে বেয়ে।

একটু মনোনিবেশ করলেই দেখা যাবে যে, প্রায় কোন ছড়াতেই অন্ত শব্দের আশ্রয়ে বর্ণগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। বর্ণগুলো ধ্বনির মত উপস্থিত, কিন্তু কোন শব্দ-সংকেত তাদের নেই। কিন্তু, এ-পথে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-স্থরীদের মধ্যে বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে বস্তু-সংকেত দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বিদ্যাসাগরের 'অ—অজগর, আ—আম' যোগীন সরকারে 'অ—অজগর আসছে তেড়ে, আ—আমটি আমি খাব পেড়ে'-তে পরিণতি লাভ করেছে।

আমাদের মনে হয়, এ ব্যাপারে যোগীন সরকারের পদ্ধতি প্রকৃষ্টতর। অন্ত শব্দের আশ্রয়ে বর্ণের পুনরাবৃত্তিতে যেমনি সুখ আছে, তেমনি তার শ্রুতিমাধুর্যও

অনস্বীকার্য। এ ছাড়াও মনস্তত্ত্বের সাক্ষ্যও বিদ্যাসাগর, যোগীন সরকারদের পক্ষেই বলে মনে হয়। একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাক।

শিশুর ভাষা-বিবর্তনের কতকগুলো সুস্পষ্ট স্তর আছে। মনস্তাত্ত্বিকরা এ সম্পর্কে যে গবেষণা করেছেন তাতে জানা যায়, শিশু যখন প্রথম অস্পষ্ট একটি দু'টি শব্দ উচ্চারণ করে, যেমন মা, বাবা ইত্যাদি, সেগুলোকে শুধুমাত্র শব্দ হিসাবে গণ্য করা চিন্তার একটা মস্ত ভুল। শিশুর 'মা' ডাক শুধু একটা সম্বোধন বা শব্দমাত্র নয়, একটা সম্পূর্ণ বাক্য; 'মা'-র অর্থ 'মা' কাছে এস', 'মা' খেতে দাও ইত্যাদি। অর্থাৎ, তার ভাষা হৃদয়ের চাওয়া বা বাসনার রসে সিক্ত। শিশুর প্রথম দিককার ভাষাকে আকাঙ্ক্ষার স্পর্শ থেকে কিছুতেই মুক্ত করা যায় না। ঐ স্তর পার হয়ে সে প্রশ্ন করতে শেখে, এটা কি, ওটা কি জানতে চায়; এবং মনস্তাত্ত্বিকদের ভাষায় তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার করে' বসে,—জানতে পায় যে, প্রত্যেক জিনিসেরই এক একটা আলাদা আলাদা নাম আছে। আবিষ্কারের পর থেকে তার অভিজ্ঞতা-লব্ধ সমস্ত জিনিসকেই কোন না কোন নামে অভিহিত করার একটা ভীষণ প্রবণতা তার মধ্যে দেখা যায়। তাই, এই সময়ে, তার শব্দের প্রয়োজনীয়তার অর্থাৎ শব্দ-চাহিদার সীমা থাকে না।

কিন্তু, এই প্রকরণের মাধ্যমে তার ভাষার একটা গভীর গুণগত রূপান্তর ঘটে। পূর্বতন বৈশিষ্ট্য বাসনা-রঙীনতা থেকে মুক্ত হয়ে ভাষা ইন্দ্রিয়গোচর পৃথিবীর বিবিধ বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। শিশুর চৈতন্য ও বস্তু-পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয়ের সীমা অত্যন্ত দ্রুত প্রসারিত হ'তে থাকে। এই বর্ধিষ্ণু জগতের সঙ্গে সে শব্দ সঞ্চয়ের সীমাবদ্ধতা দিয়ে আর কিছুতেই পেরে ওঠে না। মনোবাসনা ব্যক্ত করার জন্য নয়, বস্তুকে প্রকাশ করার জন্য, বস্তুর সার তত্ত্ব জানার জন্যই তার শব্দের প্রয়োজনীয়তা এত বেশি ঐকান্তিক।

তাছাড়া, শিশুর কাছে শব্দের অন্য অর্থ অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে, যেটা বড়োদের মধ্যে নেই। তাদের কাছে শব্দ শুধুমাত্র প্রতীক নয়, শব্দের মূল

রয়েছে বস্তু পৃথিবীর বুকে, এবং শব্দ ঐ পৃথিবীকে অত্যন্ত সত্যভাবে প্রভাবিত করে। শিশু-মনে শব্দের এই তাৎপর্য আছে বলেই কোন শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্রই সে তার বস্তুরূপ দেখতে চায়; বড়োরা 'বাতাস' বললে অমনি সে বলে বসে, 'দেখবো'। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর, এম, অগ্‌ডেন-এর কন্যা অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে, 'আমি যা বললাম তা দেখতে পাই না কেন?' * এ হেন শিশুকে শিক্ষা দেবার সমস্যা আমাদের; বস্তু তার মনে প্রশ্ন জাগায়, নাম কি? আবার, শব্দের সঙ্গে পরিচিত হলেই তার বস্তুরূপ দেখতে চায় সে। ভাবে, বস্তুর নাম যখন তার আয়ত্ত হয়েছে তখন বস্তুর তত্ত্বে তার অন্তর্দৃষ্টি লাভ ঘটেছে, বস্তুর স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। কারণ, বস্তুতে আর নামেতে তো প্রকৃত কোন পার্থক্য নেই। শিশু ভাবে, বস্তুর আপন সত্তার মধ্যেই তো তার নামের বাস।

বিদ্যাসাগর অথবা যোগীন সরকারের শিশু-মনস্তত্ত্ব নিয়ে অতটা বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ ছিল না, তথাপি, তাঁরা শিশু-মনের একটা প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়েছেন বলে মনে হয়। বর্ণকে শব্দের আশ্রয়ে বস্তু-পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে তাঁরা শিশুর পৃথিবীর সীমা যেমন প্রসারিত করেছেন, তেমনি শিশুর বস্তুজ্ঞান বৃদ্ধিরও সহায়ক হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছড়ায় মনের প্রসারের অবকাশ রয়েছে সত্য, কিন্তু "ম চালায় গোরু-গাড়ি" এ লাইনে 'ম'-কে একটা পরিপূর্ণ শব্দ ভেবে তার বস্তুরূপ দেখার আগ্রহ প্রকাশ করা শিশুর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়! 'ম'-কে অবলম্বন করে বস্তুতে যাওয়ার উপায় যখন রয়েইছে, তখন শুধু ধ্বনিকে আত্মসর্বস্বরূপ উপস্থাপিত না করে, অর্থাৎ শিশুর

---

* 'To them, words are not mere symbols, but have their roots in the world, upon which words exert a real influence (word-magic). It is therefore not so surprising that the youngest daughter of my friend and collegue, R. M. Ogden, should ask, at the age of 4. I; 'why can't we see what I have talked?' —K. Koffka.

পৃথিবীকে প্রসারিত হ'তে বাধা না দিয়ে সোজা বস্তুতে যাওয়াই আমরা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। শব্দকে পেয়েই শিশু বস্তুকে একান্ত আপনার করে পাবে। তার কাছে, শব্দের উচ্চারণ মানেই তো শব্দ যার প্রতীক তাকে অস্তিত্বশীল করা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শিশুর পাঠকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্য তো একজন মাধ্যম বা শিক্ষক আছেন। সুতরাং, বই-এর অসম্পূর্ণতা যাই থাক, শিক্ষক তা পূরণ করে নেবেন। শিশুর শিক্ষায় মাধ্যম অপরিহার্য, এবং তার বস্তুবোধ, বিশ্ববোধ ইত্যাদিকে প্রসারিত করার কর্মে শিক্ষকের অবদানের মূল্যও কম নয়। কিন্তু, প্রতিটি বর্ণের বস্তুরূপ যদি শিক্ষককেই সরবরাহ করতে হয়, এবং শিশুর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরও যদি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট না থাকে তাহ'লে গ্রন্থের সার্থকতা থাকে কোথায়? বই-এর ছড়া বা ছবি বা বর্ণ শিশু-মনে বিচিত্র প্রশ্নের উদ্দীপনা নিয়ে আসবে, সেই উদ্দীপনা উপস্থিত প্রসঙ্গকে ছাপিয়ে বহু দূরে অপ্রাসঙ্গিকে চলে যাবে। মাধ্যম বা শিক্ষক সেই কৌতূহল চরিতার্থ করবেন, উপস্থিত উদ্দীপকের কাজ তাঁর নয়। সেটা বই-এর; বই-এর সে দিককার ত্রুটি অমার্জনীয়।

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় ভাগের দু'একটি ছাড়া প্রথম এবং দ্বিতীয়ভাগে কোন গল্প নেই। অসমাপ্ত এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অসংলগ্ন টুক্‌রো টুক্‌রো বর্ণনা আছে। তার কারণ সম্ভবত এই যে, রবীন্দ্রনাথের ধারণায় শিশু-মন কোনো পরিপূর্ণ গল্পে পৌঁছায় না, টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি রচনা করে। হয়তো বা সত্য; কিন্তু, এ ক্ষেত্রেও স্মরণযোগ্য যে, শিশু মনের টুক্‌রো টুক্‌রো ছবিগুলোও আপন সমগ্রতায় আপন সংহতিতে পরিপূর্ণ। এবং আমাদের লক্ষ্য হলো শিক্ষা, অর্থাৎ বড়োদের পৃথিবীতে বড়োদের বস্তুতত্ত্বে শিশুকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেদিক থেকে আমাদের মনে হয়, এক একটি পাঠে এক একটি পরিপূর্ণ ছবি, পরিপূর্ণ একক, দেওয়াই উচিত।

কারণ, (এখানেও আমাদের শিশু-মনস্তাত্ত্বিকের আশ্রয় নিতে হয়।) এ

শতাব্দীতে মানস্-সংগঠন সম্পর্কে যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, আমাদের মধ্যে বস্তুর বোধ এক একটি সমগ্রের (whole) বোধ। মনে করা যাক, আমরা একটা সাদা কাগজে কতকগুলো কাল বিন্দু দেখতে পাচ্ছি। প্রশ্ন, আমাদের বোধ কি শুধু ঐ কাল বিন্দুগুলো সম্পর্কে? মনস্তাত্ত্বিকরা বলবেন, না; সাদা পশ্চাদভূমি, তাতে কাল বিন্দুর অবস্থান, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি মিলে যে একটি সংহত, অর্থপূর্ণ একক বা সমগ্র রূপ সৃষ্ট হয়েছে, আমাদের বোধ তার সম্পর্কে। একই পটভূমিতে সহঅস্তিত্বশীল বিন্দুগুলো সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এরা পরস্পরকে ধারণ করছে, এদের যে পারস্পরিক বৈশিষ্ট্য তা কেবল অন্যান্য বিন্দুর অস্তিত্বের জন্য, অন্যদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্যই।* ফ্লেমিং বলেন, এই সমগ্রের বোধ গ্রহণের ক্ষমতা বিকশিত না হলে প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভই হয় না।† ফ্লেমিং-এর এই অভিমতের জের টেনে আমরা বলতে পারি, শিশুর মধ্যে এই সংহত সমগ্রের বোধ যাতে সহজে জাগ্রত হ'তে পারে, আমাদের সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত; যাতে, সমগ্রের বোধ পেয়ে তারই অন্তর্বর্তী বিভিন্ন অংশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ ক'রে পুনরায় ঐ সমগ্রকে শিশু মনে মনে সৃষ্টি করতে পারে। বলা বাহুল্য, শিশুর পক্ষে এ কাজ তখনই সম্ভব, যখন সে একই পশ্চাদভূমিতে বিবিধ বস্তুকে একই সময়ে একই সঙ্গে অস্তিত্বশীল দেখতে পায়। কিন্তু, যদি একই পাঠে প্রতি বাক্যে পটভূমি বদলায়, নতুন নতুন পটভূমিতে নতুন নতুন বস্তু ক্রমাগত আসতেই থাকে, তাহ'লে শিশু-মানস তা গ্রহণে অক্ষম হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে—পড়ায় আনন্দ থাকে না বলে সে বিদ্রোহ করে। 'সহজ-পাঠ'-এর খণ্ড চিত্রগুলো এ দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হয়।

---

* "......each member 'carries every other', and......each member possesses its peculiarity only by virtue of, and in connection with, all the others..." —K. Koffka.

† Social Psychology of Education. P. 35

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। 'সহজপাঠ'-এর প্রথম ভাগের অষ্টম পাঠ। 'ভোর হোলো। ধোবা আসে। ঐ তো লোকা ধোবা।...ওর খোকা খুব মোটা, গাল-ফোলা।...ওর খুড়ো সুতো বেচে, উল বেচে। ওর মেসো বেচে ফুলের তোড়া। ...ঐ-যে ডোবা, ওখানে। ...ঐ যে ঘোড়া ছোলা খায়।... ঐ কোঠাবাড়ি। ওখানে আজ বিয়ে। ...এক জোড়া হাতি এলো। মেঝো মেসো হাতি চ'ড়ে আসে।...তার নাতি ঘোড়া চড়ে। ...পায়ে তার ফোড়া, জোরে চলে না। ঢোল বাজে।...' এখানে একের পর এক পটভূমি ভীড় করে এসেছে, বস্তুর ভীড় তো আছেই। শিশুরা কেন, বড়োরাও এদের পারস্পরিক সম্পর্কের যোগসূত্র খুঁজে পান না। তাই, শিশুর পক্ষে বাক্যগুলোর আন্তর-সম্পর্ক অনুধাবন করে পুনরায় সমগ্র চিত্রটিকে মনে মনে সৃষ্টি করা কোনো ক্রমেই সম্ভব হয় না। কারণ, সমগ্র রূপ তো এখানে একটি নয়, অনেকগুলো। এসব ক্ষেত্রে সেজন্য শিশুর পাঠ অগ্রসর হয় না। * বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বর্ণপরিচয়'-এ কোন গল্প দেননি, একটি করে সমাপ্ত বক্তব্য দিয়েছেন। সেগুলো যে সরস বা শিশু-মানসের পক্ষে উপযোগী সে কথা বলবো না, কল্পনার স্বপ্নের বিস্তার তাতে নেই; তবে তাদের সম্পর্কে অন্তত এটুকু বলা যায় যে, বক্তব্যগুলো সমাপ্ত থাকায় শিশুর নিকট বাক্যগুলোর আন্তর-সম্পর্ক অতি সহজেই ধরা পড়ে। পাঠ অগ্রসরে বাধা হয় না।

তৃতীয়ত, 'সহজপাঠ'-এর প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগে অপরূপ, চিত্ররূপময় কবিতা দেওয়া হয়েছে। সেগুলো সহজেই আমাদের আনন্দ-জগতে

---

* মনস্তাত্ত্বিকদের ভাষায় তার কারণ নির্ধারণ সম্ভব। তাঁরা বলেন, 'Just as in the case of the forest, the essential factor is the community of life; so, too, in the category of things it is a peculiar kind of cohesion which counts for most.' উদ্ধৃত খণ্ড চিত্রগুলোতে এই 'cohesion'-এর অভাব। মন তাই এ গ্রহণে কুণ্ঠিত হয়।

টানে। যেমন,

ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি
আছে আমাদের পাড়াখানি।
দিঘি তার মাঝখানটিতে,
তালবন তারি চারি ভিতে।

অথবা দ্বিতীয় ভাগের,

আকাশ-পারে পুবের কোণে
কখন যেন অন্য মনে
ফাঁক ধরে ঐ মেঘে,
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
বন্ধ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে জেগে।

কিন্তু প্রশ্ন এই, এইসব কবির সুস্পষ্ট অনুভব কি পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে-মেয়েদের মনে জাগে, না, তাতে তাদের স্বপ্নের পিপাসা মেটে? কিঞ্চিৎ কাব্যের আস্বাদন লাভ করেছেন এমন বড়োরাও অকস্মাৎ এদের, বিশেষত দ্বিতীয়টির, মাধুর্যটুকু উপভোগ করতে পারেন না, শিশুর কাছে তার উপভোগ আশা করা, মনে হয়, খুব বেশি আশা করা। শিশুদের উদ্দেশ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রে যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি; এখানে শিশুর স্বপ্ন নয়, দর্শন নয়, প্রাজ্ঞ পৌঢ়ের স্বপ্ন-দর্শনই প্রাধান্য লাভ করেছে। শিশু-মন নয়, বৃদ্ধমন এ আনন্দ-সাগরে ডুব দিতে পারে। তা ছাড়া, শিশুর শ্রবণেন্দ্রিয়কেও এরা তো বটেই, নিছক পদ্যগুলোও, যেমন 'আলো হয় গেল ভয়।' 'বায়ু বয় বনময়।' ইত্যাদি, আগ্রহান্বিত করে তোলে না। নতুন আনন্দের জন্য প্রস্তুত করে না, আরও শ্রবণ-সুখকর মাধুর্যের আশায় জাগিয়ে তোলে না। আমাদের পূর্ব আলোচনায় দেখেছি, শিশুর মনের রাজ্য আলাদা, তাদের উপযোগী কাব্যের জাতও আলাদা। এদের সঙ্গে 'হাসিখুসি'-র নিম্নোক্ত পদ্যাংশটির তুলনা করলেই

পার্থক্যটা সহজে ধরা পড়বে—

আয় রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে !
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে,
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে !
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা,
খোকার নাচন দেখে যা !

এই চিত্রটি অত্যন্ত সহজে শিশুকে তার স্বপ্নের, অধ্যাসের (illusion) রাজ্যে টেনে নিয়ে যায়। জলের ওপর নৌকা চলে স্বপ্নের মত, বন্ধনহীন। তারপরে উদ্ভট কল্পনা, নৌকা চালায় টিয়া পাখী। শিশু অমনি নেচে ওঠে, কারণ তার সৃষ্টি-নেশাবিভোর জগতে সত্যমিথ্যার বাস্তব-অবাস্তবের কোন প্রশ্ন নেই ; বড়োদের সব মিথ্যাই সেখানে সত্য, সব অসম্ভবই সম্ভব। তার কান-মন আগ্রহের আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও অবশ্য নৌকা নিয়ে কল্পনার রাজ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, যেমন 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগের ৪৮ পৃষ্ঠার কবিতায়। কিন্তু, এখানে স্বপ্ন যেন পাখা মেলেনি, নির্দিষ্ট সীমায় বড়োদের গতিতে স্থূল চিত্রের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে।

প্রসঙ্গত, বর্ণযোজনার উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যেসব পাঠ দিয়েছেন, তাদের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দু'একটি মাত্রই উদাহরণ দেবো, এবং পাশাপাশি যোগীন সরকারের বই থেকেও উদ্ধৃতি দেবো। উ-কার যোগে রবীন্দ্রনাথের রচনা :—

'গুপী টুপি খুলে শাল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ওকে চুপি চুপি ডেকে আনি। ওকে নিয়ে যাব কুল বনে। কুল পেড়ে খাব। কুল গাছে টুনটুনি বাসা ক'রে আছে। তাকে কিছু বলিনে।"

যোগীন সরকারের রচনা :—

খুকুর পুতুল টুকটুক্
দুধ খায় চুক্‌চুক্।

ং-যোগে রবীন্দ্রনাথের রচনা :—

বাদল করেছে। মেঘের রঙ ঘন নীল। ঢং ঢং ক'রে নটা বাজল। বংশু ছাতা মাথায় কোথায় যাবে? ও যাবে সংসারবাবুর বাসায়। সেখানে কংস-বধের অভিনয় হবে। আজ মহারাজ হংসরাজ সিংহ আসবেন। কংস-বধ অভিনয় তাঁকে দেখাবে। বাংলাদেশে তাঁর বাড়ি নয়। তিনি পাংশুপুরের রাজা। সংসারবাবু তাঁরি সংসারে কাজ করেন। কাংলা, তুই বুঝি সংসারবাবুর বাসায় চলেছিস? ..' ইত্যাদি।

যোগীন সরকারের রচনা :—

সিংহ মশাই, সিংহ মশাই
মাংস যদি চাও
রাজহংস দেবো খেতে
হিংসা ভুলে যাও।

বলা বাহুল্য, গদ্যাংশগুলো থেকে পদ্যাংশগুলো অনেক বেশি সরস, অনেক প্রাণবন্ত, অনেক বেশি উপাদেয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্য উদ্ধৃতিগুলোর সহজ গতি তো নেই-ই, উপরন্ত, দ্বিতীয়টিতে 'সংসারবাবু', 'হংসরাজ সিংহ', 'পাংশুপুর', 'কাংলা' ইত্যাদি মিলে একটা উৎকট ধ্বনি-পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যেটা পীড়াদায়ক তো বটেই, সংসারবাবুর মতই অস্বাভাবিক। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিশুরা এজাতীয় রচনা চায় না, অথচ এর মানে বোঝাতে ও ছেলেদের দিয়ে এ-কাহিনীর আবৃত্তি করাতে মাষ্টার মশাইদের প্রাণান্ত। সংসারবাবুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অহেতুক মাতামাতিতে শিশুদের কান-মন কাটা গেছে অনেকখানি। দ্বিতীয় পাঠের অধিকাংশ গদ্য রচনাই অত্যন্ত বিরক্তিকর, শিশুদের বা বড়োদের কারো তা ভাল লাগে না।

চতুর্থত, 'সহজপাঠ'-এ ছড়া কবিতার একান্ত অভাব। উদ্ভট বা খেয়ালি কবিতা যা আছে তাও শিশুদের উপযোগী বা সরস নয়। বর্ণ পরিচয় অংশের :—

শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ
কোণে বসে কাশে খ ক্ষ।

শিশুর কানে দস্তুরমত শ্রুতিকটু, ছন্দের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সত্বেও। 'হাসিখুসি' 'খোকাখুকু' ইত্যাদির ছড়া এবং আমাদের মা-মাসিদের মুখে মুখে যে-সব ছড়া চলে আসছে তা শুনে কোন্ শিশু না আনন্দে আত্মহারা হয়, কোন্ শিশু না ডানা মেলে আকাশে উড়তে চায়, কোন্ শিশুর কানে মনে না চমক লাগে! পূর্বে, আমরা শিশু-মনস্তত্ত্বের যে আলোচনা করেছি তাতে দেখা গেছে যে, শিশুর বর্ণাঢ্য খেলার জগতের ভিতর দিয়েই তাকে ধীরে ধীরে বড়োদের দীক্ষায় দীক্ষিত করে তুলতে হবে, শেখাতে হ'বে এমনিভাবে যে. কাজ করছে অথবা শিখছে এটা যেন শিশু টের না পায়। ছড়ার অপূর্ব যাদু ঐ দিক থেকেই প্রাণস্পর্শী। আমাদের গভীর আশঙ্কা, 'সহজপাঠ'-এ গদ্যপদ্য যেন প্রতি মুহূর্তেই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে শিখছে, বড়োদের জগতে প্রবেশ করছে, বড়োদের বস্তু-সত্য যেন তার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বড়োদের শাসনে বশ মানতে বাধ্য হলেও, মন তার গোপনে বিদ্রোহ করে, ভুলে গিয়ে তার 'অপছন্দ' প্রকাশ করে।

॥ চার ॥

'সহজপাঠ'-এর প্রথমভাগে বর্ণ পরিচয় অংশে যে সব ছবি দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে দু'একটি বাস্তব সমস্যার কথা নিবেদন করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নন্দলাল বসু-র আঁকা ছবির শিল্প-বিচার করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই, সে কাজ বিশেষজ্ঞের; আমরা শুধু শিশুর বোধে উপলব্ধিতে, আগ্রহের রাজ্যে এ-ছবি পৌঁছে দিতে গিয়ে যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, সে সম্পর্কে

ইঙ্গিত করবো। পূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, শিশুর নিকট শব্দ শুধুমাত্র ধ্বনি বা প্রতীক নয়, তার মূল ইন্দ্রিয়গোচর পৃথিবীতে, বস্তুর আন্তর সত্তায়। তাই, শব্দকে সে বস্তুতে বাস্তবায়িত দেখতে চায়। শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলো বোধ করি সে কারণেই বিচিত্রিত করা হয়। অর্থাৎ, চিত্রণের উদ্দেশ্যে, ভাব ও বক্তব্যকে সহজতর, সরসতর, অধিকতর রূপময়, এবং অর্থকে স্পষ্টতর, ধ্বনির সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা।

একথা স্মরণ রেখে একটা ছবির দিকে তাকান যাক। বৃষ্টি পড়ছে, একটি ছাতা (সম্ভবত বাঁশের, এবং মাটিতে পোঁতা), তার নীচে দু'টি মানুষ দু'দিকে মুখ করে বসে আছে। তলায় লেখা,

'শ ষ স বাদল দিনে
ঘরে যায় ছাতা কিনে।'

ছবির প্রতি আকৃষ্ট শিশুর প্রশ্ন, "বাবু, 'তালব্যশ' কোন্‌টা ?"—ওটা। মূর্দ্ধণ্য-ষ ?—ওটা। 'দন্ত্য-স' ? সত্যি তো, স ? দন্ত্য স নেই। কেন নেই ? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর কি শিশুর বাবা তাকে দিতে পারবে ? তারপর আবার প্রশ্ন, ওরা যাচ্ছে না কেন ? কেন বসে আছে ? তারও উত্তর নেই। এমনি ধরণের অসুবিধা আরও অনেকগুলো ছড়া সম্পর্কেই দেখা দেয় ; ছড়ার সঙ্গে ছবির ভাব-সঙ্গতি থাকলেও রূপগত অনৈক্য এত পরিস্ফুট যে বহু চেষ্টা করেও শিশুকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যায় খুশী করা যায় না।

শিশুর নিকট ছবি নিছক ছবি নয়, সত্য অস্তিত্বশীল বস্তু। তাই, জীবন্ত মানুষের বা প্রকৃত বস্তুর প্রতি তার যে আচরণ, ছবির প্রতি আচরণও তেমনি ; বাপমায়ের চোখের দিকে সে যে দৃষ্টিতে তাকায়, ছবিতে চিত্রিত চোখের দিকেও সে একই মনোযোগ নিয়ে তাকায়। তার কাছ থেকেও সে জীবন্ত চোখের ক্রিয়া চঞ্চলতা আশা করে। সেজন্য শিশুর উপভোগ উপলব্ধির জন্য নির্মিত ছবির বস্তু-সাদৃশ্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। বস্তুর অবয়বী সত্যতা তার নিকট অবিকৃতভাবে উপস্থাপিত না হলে তার বস্তু-জ্ঞান বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা

থাকে। তাছাড়া তার বোধ-শক্তির উপরও অবাঞ্ছিত একটা চাপ পড়ে। এ কথাগুলো বলছি তার কারণ দু'একটি ছবি– যেমন 'ট ঠ ড ঢ'-এর এবং 'হ ক্ষ'-এর উপরকার—প্রায় বিমূর্তন বা abstraction-এর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যেটা শিশুর প্রত্যয়ে (perception) ধরা পড়ে না। বস্তু সম্পর্কিত চেতনা গভীর হলে তবেই বস্তুর নির্যাস নিয়ে তৈরী বিমূর্ত ভাবরূপ শিশু-মানসে প্রতিভাত হতে পারে। বৃক্ষের বোধ প্রখর হলেই বৃক্ষতা-বোধ জাগ্রত হতে পারে। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরে উপনীত হলে পর এইরূপ চিন্তা বা ভাবসম্পদ শিশুর পক্ষে গ্রহনীয় হয়। শিশুর মনকে রাঙিয়ে দেওয়া, রসিয়ে দেওয়া, বোধের দীপ্তিতে প্রখর করা, রূপের চেতনায় মোহিত করা, ইত্যাদি যদি ছবিগুলোর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহ'লে সে উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ। কারণ, আমাদের সাক্ষ্য অন্যরূপ।

শিশু-মানসের প্রয়োজন মিটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনীষা, প্রাজ্ঞবোধ এবং সরস হৃদয় নিয়ে শিশুপাঠ্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এবং প্রাচীন পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা থেকে শিশু-শিক্ষাকে পূর্ণতার পথে, সংহতির পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর অবদানে শিশু-শিক্ষার ধারা সমৃদ্ধতর হয়নি—একথা বলা মূঢ়তা; কিন্তু, একক প্রচেষ্টা হিসাবে, সমগ্র বিচারে, তিনিও স্বার্থক হয়েছেন—একথা কোন মতেই বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ অন্য একদিক থেকেও প্রাচীন ঐতিহ্য অস্বীকার করেছেন; যথা 'সহজপাঠ'-এর প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগের সমুদয় রচনা রবীন্দ্রনাথের নিজের। তাতে, মনে হয়, বৈচিত্র্যের কিছুটা অভাব ঘটেছে। অধিকাংশ ইংরেজী শিশুপাঠ্য বইও, দেখা যায়, একজন লেখকের রচনায়ই পূর্ণ। কিন্তু, সে সব বই-এর এমন একটা অপরূপ বৈশিষ্ট্য আছে যা অনায়াসে শিশুর মনকে এবং কানকে এক অভিনব রাজত্বে নিমন্ত্রণ জানায়। অধিকাংশ বাংলা বই-ই সেদিক থেকে অপূর্ণ। 'সহজপাঠ'-এর তৃতীয়-চতুর্থ ভাগে অন্যদের গদ্য রচনা নেওয়া হয়েছে—তাঁরা শান্তিনিকেতনের

লেখক। কিন্তু, শান্তিনিকেতনের কবিদেরও কোন কবিতা নেওয়া হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় তৃতীয়-চতুর্থ ভাগ অনেক বেশি সরস, সজীব এবং উপভোগ্য। গদ্যাংশে গল্প যেমন আছে, রচনাও প্রসাদ গুণে উজ্জ্বল।

দুই ঠাকুরের স্বপ্ন

॥ এক ॥

বাংলা সাহিত্যের এবং বিশেষ ক'রে বাংলা কিশোর সাহিত্যের আলোচনায় স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর প্রসঙ্গ মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং কথা-সাহিত্যিক ; অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ছোটগল্পের পরিবেশনে বাংলা সাহিত্যকে উজ্জ্বলতর ক'রেছেন। এবং উভয়েই মানবমনের এক পৃথক পরিবেশে, শিশু ও কিশোরদের স্বপ্নের পৃথিবীতে যে অপরূপ রূপকাহিনী সৃষ্টি ক'রেছেন তা নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। দক্ষিণারঞ্জন এবং সুকুমার রায়-এর উদাহরণ সামনে থাকা সত্ত্বেও কিশোর-সাহিত্যের রচনায় রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ-এর তুলনা নেই। সাহিত্য-সৃষ্টিতে মন দিয়ে তাঁরা গভীর থেকে গভীরতর কিশোর-মানসের পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, এবং কিশোর-হৃদয়ের আশা, স্বপ্ন, যন্ত্রণা ও আনন্দের উৎস যে চেতনা-অবচেতনার রহস্যময় মিলনভূমি, ততদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ-জন্যই তাঁরা বাংলা কিশোর-সাহিত্যে বিশিষ্ট নন ; কেননা, রূপকাহিনীর দক্ষিণারঞ্জন এবং আবোলতাবোল-এর সুকুমার রায় চেতন-অবচেতনের একই ভূমি স্পর্শ ক'রতে পেরেছেন। দুই ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য, কিশোর-সাহিত্যেও তাঁরা পরিশুদ্ধ মানবতার ধ্যান ও ধারণাকে স্পষ্ট ক'রেছেন। যন্ত্রণায় দগ্ধ আজকের মানবসভ্যতার সঙ্গে শিল্পীমনের গভীর প্রেম থাকা সত্ত্বেও কঠিন বিরোধ র'য়েছে ; এবং এই মিলন ও সংগ্রামের সকল কাহিনীকে অতিক্রম ক'রে মানুষের চেতনা আরেক পরিশুদ্ধ-ভবিষ্যত-সভ্যতাকে জননীর মত নিজের গর্ভে সৃষ্টি ক'রছে, রক্তের মধ্যে সেই অপরিণত শিশু-সভ্যতাকে লালন ক'রছে। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বমূলক সমস্যা এবং সম্পর্কের সক্রিয়, যথার্থ রূপটি কিশোর সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন।

॥ দুই ॥

যদিও দু'জনের সাহিত্যসৃষ্টির উপকরণ ও পথ অধিকাংশক্ষেত্রেই বিপরীত বা পৃথক। একজনের কিশোর-জগৎ মুক্তির কামনায়, পদে পদে বন্ধন ও নিষেধের যন্ত্রণায় আর্ত এবং বিবর্ণ; অন্য ঠাকুরের কিশোর-পৃথিবী আলো ও আনন্দের ঘনিষ্ঠ প্রতিফলনে বলিষ্ঠ ও রূপবান। অবনীন্দ্রনাথের নায়কেরা নির্ভীক, সম্মুখ-সমরে অটল এবং যথার্থ অর্থে পুরুষ; কিন্তু সবার উপরে তারা প্রেমিক। 'আলোর ফুলকি', 'রাজকাহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা', সর্বত্রই এই প্রেম ও পুরুষকারের সংমিশ্রণ এক অপরূপ প্রশান্তির সৃষ্টি করেছে। যে নালক সারাজীবন পথ হেঁটে এবং প্রতীক্ষা করে' সারাজীবনে বুদ্ধের দর্শন পেল না, সেই নালক-চরিত্র তাঁর অচরিতার্থ-বাসনার সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই প্রশান্তির আশীর্বাদে অপরূপ। রবীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্যের নায়কেরা এই প্রশান্তি জীবনেও পায় নি, এবং অচরিতার্থ-মুক্তির কামনা বুকে করে' তারা সকলেই দগ্ধ। 'ডাকঘর', 'শিশু', কিংবা 'শিশু ভোলানাথ'-এর ক্ষুদে নায়কেরা সকলেই হাত বাড়িয়ে আছে এমন এক স্বপ্নরাজ্যের দিকে, যাকে বাস্তব জীবনে কেউ পায় না।* 'মুকুট'-এর কাহিনী আত্মকলহে বিষাক্ত এবং তার প্রতিটি চরিত্রকেই পরিণামে ধ্বংস অথবা মৃত্যুর স্বাদ নিতে হয়েছে। 'বিসর্জন'-এও একই হতাশা এবং বিষাদের সুর। 'ডাকঘর'-এর চার দিকে বন্ধ দেয়াল; মাঝখানে একটি অসহায় মানবশিশু মুক্তির জন্য, একমুঠো নির্মল হাওয়ার জন্য, কখনো সকাতর প্রার্থনা, কখনো আর্তনাদ করছে। সেই বন্ধ

* 'শিশু' এবং 'শিশু-ভোলানাথ'-এ অবশ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হবার মত কোন অস্থির অভিজ্ঞতা আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। শিশু-মনের স্বপ্ন ও কামনায় উভয় পুস্তকের অধিকাংশ কবিতাই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্যের সঙ্গে এ-দু'টি কাব্যপুস্তকের বক্তব্য ও সুরের তুলনা টানলে মৌলিক পার্থক্য ধরা পড়ে। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'—এই অবচেতনার স্পন্দন যেমন 'ডাকঘর,' 'মুকুট,' বা 'বিসর্জন'-এর কাহিনীতে, তেমনি 'শিশু' এবং 'শিশু-ভোলানাথ'-এর অনেক কবিতাতেই সুস্পষ্ট।

দেয়ালে তিলে তিলে মৃত্যুর সর্বনাশের দিকে আকর্ষিত হতে থেকেও ঐ শিশু তথাপি একটি আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় নি ; এ আনন্দ স্বপ্ন-দেখার। কিন্তু বৃদ্ধ মানবসভ্যতা তার মুক্তি-স্বপ্নের কোন সঙ্গত অর্থই খুঁজে পায় না, এবং এক উচ্ছৃঙ্খল রুগ্নমনের প্রতিফলন বলেই হৃদয়ে নেয়। এই কঠিন রোগের প্রতি-ষেধক ব্যবস্থা স্বরূপ যতটুকু স্বপ্নের আলো, মুক্তির হাওয়া ছোট্ট একটি জানালার মধ্য দিয়ে বন্দী শিশু-মানুষের চারদেয়ালে প্রবেশ করতো, তাদের বিরুদ্ধেও বৃদ্ধের লড়াই সুরু হ'য়ে যায় ; জানালার কপাটে এবার শক্ত খিলের বেড়ি পরানো হয়। অথচ মানবসভ্যতার সঙ্গে শিশু-মানুষের সম্পর্ক প্রেমের, পরস্পরকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকার। এখানেই 'ডাকঘর'-এর ট্র্যাজেডী। ভালবেসে, মঙ্গলকামনার আধিক্য থেকেই একজন অপরকে হত্যা করে, তার চোখ থেকে আলো, বুক থেকে নিঃশ্বাস পর্যন্ত কেড়ে নেয়—এই অনুভব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা হলেও, সমকালীন মানবসভ্যতা ও মানবসমাজের পটভূমিকায় তা ঐতিহাসিক সত্য। মানব-ইতিহাসের এই সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন সর্বনাশের মত চেতনায় অনুভব করেছিলেন ; তাই অমলের ট্র্যাজেডীতে কোনদিকেই সান্ত্বনা তিনি রাখেননি একটিমাত্র মিথ্যার আনন্দ ছাড়া। পারিপার্শ্বিক সত্যের কোথাও যেখানে এই মরণাপন্ন শিশুর জন্য একফোঁটা আনন্দ ছিল না, সেখানে তিনি মিথ্যার অমৃত পরিবেশন করে' অন্ততঃ শিশুর আত্মাকে বাঁচালেন। এই মিথ্যা, অমলকে লেখা রাজার হাতের চিঠি, একদিন মানুষের সভ্যতায় সত্য হয়ে উঠবে ;—সেই ভবিষ্যতের অস্পষ্ট স্বপ্নটুকুই 'ডাকঘর'-এর একমাত্র আলো এবং হাওয়া ; আর সর্বত্রই সকল দুয়ার রুদ্ধ।

অদ্যাবধি 'মুকুট', 'রাজর্ষি', 'ডাকঘর'-এর পৃথিবী তার অপ্রেমের, বিচ্ছেদের এবং শাসনের যন্ত্রণা নিয়ে শিশু-মানুষের পৃথিবীতে বদ্ধ দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। এই বয়োবৃদ্ধ পৃথিবীর মুখোমুখি আমরা, আজকের শিশু-মানুষেরা শিশুর মতই অসহায়। একই অপ্রেম, বিচ্ছেদ এবং শাসনকে আমরা মানব-সভ্যতার অমোঘ নিয়তি বলে' চিরদিন মেনে আসছি ; এবং আরো সুদীর্ঘকাল

হয়তো মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে এই
চারদেয়ালের যন্ত্রণাই সত্য হয়ে থাকবে। 'মুকুট', 'বিসর্জন', 'ডাকঘর'-এর
রবীন্দ্রনাথের চেতনা তাই শেষ পর্যন্ত জীবন-অনুভবের যন্ত্রণাই।* যে যন্ত্রণা
পাথরমোড়া মানবসভ্যতায় কোথাও অঙ্কুরিত হবার মত প্রেমের মাটি নেই
বলেই 'অন্য কোন খানে'-র আশ্রয় খোঁজে, কিন্তু কোনদিনই তাকে পায় না।

॥ তিন ॥

কোন স্রষ্টা যদি এই যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে' জীবনের অন্য এক সত্যে (যে
সত্য তাঁর সামাজিক জীবনের পারিপার্শ্বিক অনুভব ও অভিজ্ঞতায় কদাচিৎ
প্রতিফলিত হয়) তথাপি অগ্রসর হ'তে পারেন, তখনই আমরা এমন একজন
পরিশুদ্ধ প্রেমিকের সঙ্গে মুখোমুখি হই যাঁর সৃষ্টি সূর্যের আলোর মত আমাদের
নষ্ট আত্মাকেও রোগমুক্ত করে, আমাদের নির্মল এবং আনন্দিত করে। 'কথা
ও কাহিনী'-র কবিতাগুচ্ছ এবং 'শিশু', 'শিশু-ভোলানাথ' এবং 'সহজপাঠ'-এর
কয়েকটি কবিতার পাঠে আমরা এবং আমাদের কিশোর পাঠকেরা উপরোক্ত

---

* কিশোর-সাহিত্যের প্রতিফলনে রবীন্দ্রচেতনায় জীবন-অনুভবের যে যন্ত্রণা মাঝে মাঝেই
আত্মপ্রকাশ করেছে, জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতায় তার তুলনা পাওয়া যায়। অথচ
এই যন্ত্রণাকে অতিক্রম করার, এবং পরিশুদ্ধ মানবতাকে শুধু স্বপ্নে নয়, সামাজিক অভিজ্ঞতার
মধ্যেও লাভ করার জন্য দু'জনেই কত বেশি উন্মুখ ছিলেন, এবং মানুষের ব্যবহার থেকে মাঝে
মাঝেই বিপরীত অভিজ্ঞতায় তাঁরা কী পরিমাণ রক্তাক্ত হয়েছিলেন, উভয়ের সাহিত্য-সৃষ্টিতে
আমরা তার প্রচুর নিদর্শন পাই। আমাদের অবাক হওয়ার মত মানবপ্রেম (humanism) ও
প্রাণশক্তি তাঁদের মধ্যে ছিল বলেই জীবন-অনুভবের সকল যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে' উভয়ের
কবিতা সুচেতন স্তরে পৌঁচেছে; এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁরা পরিশুদ্ধ মানুষের পরিবার বা
সমাজকে চোখে দেখে যাবার আশা ত্যাগ করেন নি।

পরিশুদ্ধ অনুভব ও অভিজ্ঞতাকেই চেতনায় পাই। 'সহজপাঠ' থেকে উদাহরণের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যকে পরিষ্কার করতে চাই :

কালো রাতি গেল ঘুচে,
আলো তারে দিল মুছে।
পুব দিকে ঘুম-ভাঙা
হাসে উষা চোখ-রাঙা।
নাহি জানি কোথা থেকে
ডাক দিল চাঁদেরে কে।
ভয়ে ভয়ে পথ খুঁজি
চাঁদ তাই যায় বুঝি।
তারাগুলি নিয়ে বাতি
জেগেছিল সারা রাতি,
নেমে এল পথ ভুলে
বেলফুলে জুঁইফুলে।
বায়ু দিকে দিকে ফেরে
ডেকে ডেকে সকলেরে।
বনে বনে পাখি জাগে।
মেঘে মেঘে রঙ লাগে।
জলে জলে ঢেউ ওঠে।
ডালে ডালে ফুল ফোটে।

এ-ছাড়া :

আলো হয়
গেল ভয়
চারিদিক
ঝিকি মিক্।
বায়ু বয়
বনময়।
বাঁশ গাছ
করে নাচ।
দিঘি জল।
ঝল্‌মল্।
যত কাক
দেয় ডাক।...

অথবা

ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি
আছে আমাদের পাড়াখানি।
দিঘি তার মাঝখানটিতে,
তালবন তারি চারি ভিতে।
বাঁকা এক সরু গলি বেয়ে
জল নিতে আসে যত মেয়ে।
বাঁশগাছ ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে,
ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি নড়ে।...

প্রভৃতি অজস্র পরিচ্ছন্ন পংক্তি 'সহজপাঠ'-এর শান্ত, শুদ্ধ পরিবেশকে আমাদের চেতনায় আকর্ষণ করে। এমনি পরিশুদ্ধ কবিতা 'শিশু', 'শিশু-ভোলানাথ' এবং

এখানে-ওখানে ছড়ানো রবীন্দ্রনাথের অজস্র কিশোর-রচনায় আমরা পাই। 'কথা ও কাহিনী'-র সমস্ত কবিতাই আমাদের মানবীয় চেতনাকে উর্ধ্বে আকর্ষণ করে, এক অপরূপ জাগরণের অনুভবে আমরা ভয় এবং নির্জীবন, রুগ্ন পরিবেশের সমস্ত যন্ত্রণাকে অতিক্রম করি।

কিন্তু এই জাগরণের অনুভব যে সাহিত্যস্রষ্টার কিশোর-রচনায় সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছে, তিনি অন্য একজন, রবীন্দ্রনাথেরই আত্মীয় এবং শিষ্য, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'আলোর ফুলকি', 'বুড়ো আংলা', 'নালক', 'রাজকাহিনী' স্রষ্টার সেই সুচেতন মুহূর্তগুলিরই সার্থক প্রতিফলন যা আমাদের অনেকের জীবনেই কদাচিৎ আসে, অথবা আসে না।

অবনীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্যে মানবস্বপ্নের মুক্ত বিচরণভূমি আছে, কিন্তু এই স্বপ্ন কোন অচরিতার্থ কামনার ফসল নয়। 'আলোর ফুলকি', 'নালক, 'রাজকাহিনী'-র নায়কদের স্বপ্ন সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং সংকল্পে অনায়াসে আবর্তিত, প্রতিফলিত হয়। 'আলোর ফুলকি'-র কুঁকড়ো বিশ্বাস করতো যে, সে শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে সূর্যকে আহ্বান না করলে আলোর ফুল আর পৃথিবীতে ফুটবে না। তার এই বিশ্বাসে কোন আর্তনাদ বা অতৃপ্তি নেই; যে পৃথিবী কুঁকড়োর, সে পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথা চলে যাওয়ার মন তার নেই। নালক কোনদিনই অমিতাভ বুদ্ধের দর্শন পেল না; কিন্তু সেজন্য তার মন কখনোই যন্ত্রণায় আর্ত নয়। সে জানে প্রতীক্ষা করতে, যে প্রতীক্ষাকে সময় কখনো বিপন্ন অথবা বিবর্ণ করতে পারে না। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এই বিশ্বাস, প্রতীক্ষা এবং পুরুষকার সর্বত্র ক্লাসিসিজম্-এর উদাত্ত সুরটিই চেতনায় আনে। মানব-চেতনায় জীবন অনুভবের যন্ত্রণা বোধ করা এবং এই যন্ত্রণাকে অতিক্রম ক'রে প্রেম, বিশ্বাস, আনন্দের গভীরতায় অবতরণ ও অবগাহন করাই যদি ক্লাসিক সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচিতি হয়, তা হ'লে অবনীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে একাধিক ক্লাসিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন। যন্ত্রণার অনুভব ছাড়া আনন্দে পৌঁছানো যায় না; কিন্তু সকল যন্ত্রণাই আমাদের আনন্দ পর্যন্ত টানে না,

অথবা আমরা ততদূর অগ্রসর হতে জানি না, শিখি না। ফলে যে যন্ত্রণাকে ভয় করে' অথবা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়ে আমরা অধিকদূর অগ্রসর হবার মনকে অবদমন করি, সে যন্ত্রণা আমাদের গ্রাসই করে; আনন্দে, প্রেমে, বিশ্বাসে পৌঁছানো তখন আর আমাদের সাধ্যে থাকে না। 'আলোর ফুলকি' এবং 'নালক' আমাদের এই যন্ত্রণাকে অতিক্রমের সাহস দেয়। 'রাজকাহিনী'-র পাতায় পাতায় যে পৌরুষ ও আত্মমর্যদাবোধের ছবি আমাদের জন্য অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, সেখানেও মৃত্যুকে জয় করবার, ভয়কে অতিক্রম করবার সংকল্প ও চেতনাই আমাদের বিশ্বাসকে সুস্থ রাখে, স্বপ্নকে গভীরতা দেয়।

উদাহরণের সাহায্যে উপরোক্ত সকল বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা পরিমিত আকারের একটি প্রবন্ধে দুঃসাধ্য। অবনীন্দ্র-মানসের একটি সুস্পষ্ট ছবি তখনই পাওয়া যেতে পারে যদি তাঁর কিশোর-সাহিত্যগুলি এবং অনবদ্য গল্প সংগ্রহ 'পথে বিপথে'-এর বিস্তারিত আলোচনাকে পটভূমিকায় উপস্থিত করা যায়। এক্ষেত্রে আমরা 'আলোর ফুলকি' থেকে একটি মাত্র কথাচিত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের চেতনা আমাদের বোধে কী পর্যন্ত কাজ করে তারই আভাস দিতে চেষ্টা করবো।

"...সোনালিয়া, প্রায় সবই তো শুনলে, আরো যদি জানতে চাও তো বলি, আমাকে সুর খুঁজে খুঁজে তো গান গাইতে হয় না, সুর আপনি ওঠে আমার মধ্যে মাটি থেকে লতায় পাতায় রস যেমন করে উঠে আসে, গানও তেমনি করে' আমার মধ্যে ছুটে আসে আপনি, জন্মভূমির বুকের রস। পুব আকাশের তীরে সকালটি ফুটি-ফুটি করছে, ঠিক সেই সময় আমার মধ্যে উথলে উঠতে থাকে সুর আর গান, বুক আমার কাঁপতে থাকে তারি ধাক্কায়, আর আমি বুঝি আমি না হ'লে এই সরস মাটির এই সুন্দর পৃথিবীর বুকের কথা খুলে বলাই হবে না। সকালের সেই শুভ লগ্নটিতে মাটি আর আমি যেন এক হয়ে যাই, মাটির দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাই আর পৃথিবী আমাকে সুন্দর শাঁখের মতো নিজের বিশ্বাসে পরিপূর্ণ করে' বাজাতে থাকে, আমার

মনে হয় তখন আমি যেন আর পাখি নই, আমি যেন এক আশ্চর্য বাঁশি, যার মধ্য দিয়ে কান্না আকাশের বুকে গিয়ে বাজছে।

অন্ধকারের মধ্য থেকে ভোর রাতের হিম মাটি এই যে কাঁদন জানাচ্ছে, আকাশের কাছে তার অর্থ কী সোনালিয়া, সে আলো ভিক্ষে করছে, একটুখানি সোনার আলো-মাখা দিন তারি প্রার্থনা। ভোর বেলায় সবাই কাঁদছে, দেখবে, আলো চেয়ে, গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে আর বলছে, আলো দিয়ে ফোটাও। ওই যে ক্ষেতের মাঝে একটা কাস্তে, চাষারা ভুলে এসেছে, সে মাটিতে পড়ে মরচে ধ'রে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো, একটু আলো যেন এসে রামধনুকের রঙে চারদিকে ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়।

নদী কেঁদে বলছে, আলো আসুক, আমার বুকের তলা পর্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক। সব জিনিস চাচ্ছে যেন আপন আলোয় তাদের রঙ ফিরে পায়, আপনার আপনার হারানো ছায়া ফিরে পায়। তারা সারা রাত বলছে, আলো কেন পাচ্ছিনে, আলো কী দোষে হারালেম।

আর আমি কুঁকড়ো তাদের সে কান্না শুনে কেঁদে মরি, আমি শুনতে পাই ধানখেত সব কাঁদছে, শরতের আলোর সোণার ফসলে ভরে উঠবার জন্যে, রাঙা মাটির পথ সব কাঁদছে, যারা চলাচল করবে তাদের ছায়ার পরশ বুকের উপর বুলিয়ে নিতে আলোয়। শীতের গাছের উপরের ফল আর গাছের তলায় গোল-গোল নুড়িগুলি পর্যন্ত আলো, তাপ চেয়ে কাঁদছে, শুনি। বনে-বনে সূর্যের আলো কে না চাচ্ছে বেঁচে উঠতে, জেগে উঠতে, কে না আলোর জন্য সারা রাত কাঁদছে। এই জগৎ শুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা, এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে, তখন আমি আর ছোটো পাখীটি থাকিনে, বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে, শুনি, আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তারপর আমার গান ফোটে, 'আ-লোর ফুল!' আর তাই শুনে পুবের আকাশ গোলাপি কুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে, কাক-সন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায়, কিন্তু আমি গান গেয়ে চলি,

আকাশে কাকডিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তারপর হঠাৎ চমকে দেখি আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হ'য়ে গেছে, আর আকাশে আলোর জবাফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি, পাহাড়-তলির কুঁকড়ো…"

অবনীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে আমাদের এক সাহিত্যিক বন্ধু তাঁর প্রবন্ধে এই ভাবে উপস্থিত করেছেন যে, সেখানে একটি সহজ আনন্দ, অমলিন উৎসবের সুর আছে। কথাটি আংশিক সত্য, কিন্তু হয়তো পরিপূর্ণ সত্য এই বর্ণনায় প্রকাশিত হয়নি। অবনীন্দ্রনাথের ছোটগল্প এক কথায় ক্লাসিক, সেখানে আনন্দ, উৎসব সকল কিছুই এসেছে, কিন্তু অনেক যন্ত্রণা অনেক অপ্রেমের অনুভবকে অতিক্রম করে'। নিদারুণ যন্ত্রণাতেই বাঁশের ভেতরটা একদিন ফুটো হতে থাকে, এবং তারপর কখনো বা বাঁশি হয়। অবনীন্দ্র-মানস এই ফুটো বাঁশের বাঁশি।* সেখানে সহজ সুরের যা স্বাচ্ছন্দ্য তা সহজ মনের সহজ অভিজ্ঞতা থেকে আসেনি। কিশোর সাহিত্যেও অবনীন্দ্রনাথ আনন্দ এনেছেন, উৎসব এনেছেন, কিন্তু সবার উপরে তিনি এনেছেন জীবন অনুভবের মানবীয় চেতনা, এবং এই চেতনার পরিশ্রমী ফসল, পরিশুদ্ধ মানবতা।

॥ চার ॥

যে অনুভব অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে চিরন্তনী, রবীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্যে তা সাময়িক, এর কারণ পারিপার্শ্বিক এবং মানস পৃথিবীর মধ্যেকার পার্থক্য।† অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পারিপার্শ্বিক সমস্ত অনুভবের মধ্যে উপস্থিত

* রবীন্দ্রনাথের কিশোর পাঠ্য অধিকাংশ গদ্যরচনাই তাঁর যৌবনকালে রচিত। অবনীন্দ্র-নাথের সমস্ত রচনাই প্রৌঢ় মনের ফসল। যৌবনের উচ্ছ্বাস ও উত্তাপ এবং প্রৌঢ় বয়সের অভিজ্ঞতা ও প্রশান্তিই স্বধর্ম। যৌবনকাল যেমন বর্তমানকে নিয়ে প্লাবিত হতে চায়, যৌবনোত্তর-কাল তেমনি অতীতের গভীরে স্মৃতির অন্বেষণ করে।

† অবনীন্দ্রনাথের 'পথে বিপথে' এবং বিশেষ করে এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'অস্থি' ছোট গল্পটি পঠিতব্য।

থেকেও অন্য এক পৃথিবীতে ধ্যানস্থ ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য
পত্রিকা, শান্তিনিকেতন, রাজনৈতিক মতবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে আর দশজন
মানুষের সঙ্গে এবং নানা কর্মের মধ্যে এত বেশি জড়িয়ে থাকতেন যে, এই
ধ্যানস্থ হৃদয়ের প্রকাশ তাঁর অজস্র সাহিত্য-সৃষ্টিতে সুলভ ছিল না।

'রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম...' অথবা 'আলো হয়, গেল ভয়...'
প্রভৃতি কবিতায় চেতনার যে জাগরণকে তিনি উপলব্ধি ও প্রকাশ করেছেন
তাঁর বহু কবিতার মধ্যেই তা দুর্লভ। আশেপাশের সংসার ও সম্পদের নানা
বৈষম্য তাঁকে পীড়িত করতো এবং ধ্যানভঙ্গ ঋষির মত তখন তিনি ক্রুদ্ধ ও
বিচলিত হতেন, প্রতিবাদ করতেন।* এদিক থেকে অবনীন্দ্রনাথের তুলনায় তিনি
মানুষের পৃথিবীতে অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি ছিলেন এবং সমকালীন
সময়ের মধ্যে ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য স্রষ্টার যে মানসকে
প্রতিফলিত করে তা সামন্ততান্ত্রিক যুগ ও চিন্তার মধ্যকালীন কোন কবিমানসকে
স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ আজকের মানুষ, তাঁর মনও আধুনিক।

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন ঋষি ছিলেন যিনি কবি, কিন্তু সর্বপ্রথম হিউম্যানিষ্ট্।
সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈষম্য, অমানুষিকতা বা শোষণের প্রতিবাদ
না করে তিনি কোনদিন স্থির থাকতে পারেননি। তাঁর শিল্পকর্মেও এই
অস্থিরতা বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে শিল্পী এবং
শেষেও শিল্পীই। পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর যুদ্ধ, কোলাহল, সর্বনাশের মধ্যে
থেকেও তাঁর মন স্বপ্ন ছেড়ে কখনো সমকালীন ঘটনার স্রোতে ভেসে যায়নি।
যে পৃথিবী আজ মৃত, যে সভ্যতার অস্থিটুকুই আজ অতীত-আহরণের স্মৃতি
এবং সঞ্চয়, সেখানে তিনি কল্পনা ও শিল্পকর্মকে নিযুক্ত করেছিলেন ঐতিহাসিক
কবির মন নিয়ে। হারিয়ে-যাওয়া অতীত দিনের রূপকথাকে তিনি নূতন
করে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, ফসিলের মধ্যে কান পেতে জীবনের হৃৎস্পন্দন

---

* কথা ॥

অনুভব করার মন ছিল তাঁর। তাই বর্তমানের কোন যুদ্ধ, কোন হতাশাই তাঁকে বিচলিত করেনি।

বর্তমানের প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে চলতে হয়েছে বলে, সমকালীন মানুষ এবং পৃথিবীকে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে ভালবাসতে হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথের মনে মাঝে মাঝেই আশাভঙ্গের যন্ত্রণা লেগেছে। অবিশ্বাস, অকৃতজ্ঞতা, ঈর্ষা, ব্যভিচার প্রভৃতির সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নানা চাক্ষুষ পরিচয়ের ফলে তাঁর মনে তিক্ততা এবং স্বপ্নে হতাশা এসেছে। মাঝে মাঝেই তাঁর জরাক্রান্ত হৃদয়ে এমন প্রশ্ন জেগেছে যে, বস্তুত মানুষের পৃথিবীতে 'মানুষ' আছে কি না ; অথবা পৃথিবীতে কোথাও সেই পবিত্র উজ্জ্বল দীপশিখা আছে কি না, অন্ধকারের সমস্ত বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম ক'রে মানুষের প্রেমে প্রতিফলিত হওয়াই যার স্বভাব। মানুষের সঙ্গে বড় বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার এবং মানুষের কাজে নিজেকে গভীর ভাবে নিবিষ্ট করার সাধ থেকে তিনি সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদনা করেন, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে প্রত্যহের অজস্র মানুষের সংস্পর্শে তাঁর অধিকাংশ সাহিত্যসৃষ্টিই ধ্যানভঙ্গ ঋষির মন্ত্রোচ্চারণের মত। সেখানে অবগাহনের প্রাপ্তিতে অকস্মাৎ বাধা আসে। নানা মানুষের কণ্ঠ সর্বদাই কানে ভাসে। কখনো কখনো অসমাপ্ত রচনা প্রয়োজনীয় কথা ও কাজের ভিড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য চাপা পড়ে। সুচেতন মুহূর্তগুলি কবির কাছ থেকে নীরবেই বিদায় নেয়। অবনীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক দায়িত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের ; সে দায়িত্ব তিনি আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এ-সব দায়িত্বের কোনটিকেই তিনি নির্বিঘ্নে পালন করতে পারেন নি। সংগঠনের পরিচালনায় অর্থের প্রশ্ন আসে ; এবং আজীবন এই পয়সার জন্য তিনি দুশ্চিন্তায় ভুগেছেন, নানাজন এবং নানা-প্রতিষ্ঠানের কাছে হাত পেতেছেন, তার চেয়েও বড় কথা, দৈনন্দিন আয় ব্যয়ের হিসেব কষেছেন। তথাপি, আর্থিক প্রতিকূলতাই সব নয়, অন্য বিরুদ্ধতার কাছে কিছুই নয়। সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীন মতামত

প্রকাশের জন্য এবং শান্তিনিকেতনের পরিচালনায় তাঁকে আজীবন নানা মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শত্রুতার মুখোমুখি হতে হয়েছে, দলীয় এবং ব্যক্তি-মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও নীচতাকে ভয়াবহ বাস্তব সত্য বলে' জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে গ্রহণ করতে হয়েছে। এ-সব অভিজ্ঞতা হয়তো অবনীন্দ্রনাথের জীবনেও এসেছে, তবে এত প্রচণ্ডতা নিয়ে নয়। ধ্যানস্থ শিল্পীর শত্রু পৃথিবীতে বেশি থাকে না, কিন্তু সচেতন হিউম্যানিষ্ট্-এর বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীটাই।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনায় তথাপি মানব-প্রেম এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত সক্রিয় থেকেছে, এবং বাস্তব অভিজ্ঞার কোন আঘাতই এ প্রেম বা বিশ্বাসকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারে নি। 'আলোর ফুলকি' বা 'নালক' তিনি সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বহু পূর্বেই তিনি 'গোরা', 'রাজা', 'রক্তকরবী' সৃষ্টি করেছেন। ধ্যানভঙ্গ ঋষির মত তিনি মাঝে মাঝেই বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন সত্য,* কিন্তু ঋষির মতই প্রজ্জ্বলিতও হয়েছিলেন একদিন।† আজীবন তিনি জীবন অনুভবের যন্ত্রণাতে দগ্ধ হ'য়েছেন,কিন্তু পুড়ে অঙ্গার হয়নি, জ্যোতির্ময় সূর্য-ই হয়েছেন। আলোর সঙ্গীত এবং বিশ্বাসের মন্ত্র অবনীন্দ্রনাথের বহু পূর্বেই তিনি রচনা করেছেন, কিন্তু তিনি আমাদের অনেক কাছের মানুষ, আজকের দিনের মানুষ; তাই অতীত কাল, অতীত কীর্তিকে পেছনে ফেলে অন্ধকার বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের পথও খুঁজেছেন। অবনীন্দ্রনাথ-এর তুলনায় অনেক কঠিন মানবীয় দায়িত্বকে স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি।

॥ পাঁচ ॥

'ডাকঘর', 'কথা', 'বিসর্জন' এবং 'আলোর ফুলকি', 'নালক', 'রাজকাহিনী' বাংলা কিশোর-সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি। একমাত্র ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের

* 'সে', 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি'।
† 'কথা'।

যুথপতি ও চিত্রগ্রীব (মূল : ইংরেজী)-এর সঙ্গেই অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' অথবা 'আলোর ফুলকি'-র তুলনা হতে পারে ; তবে ভাষার সৌন্দর্যে প্রকাশের অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে বাংলা সাহিত্যে 'আলোর ফুলকি' তুলনাহীন। রবীন্দ্রনাথের কোন রচনার এবং 'নালক' ও 'রাজকাহিনী'-র তুলনা বাংলা সাহিত্যে নেই। সুকুমার রায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং গিরীন্দ্রশেখর বসুও বাংলা ভাষায় অতুলনীয় কিশোর-সাহিত্যের রচনা করে গেছেন ; তথাপি পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি ক'রেই এ-কথা লেখা সম্ভব যে, দুই ঠাকুরের লেখায় যে গভীর মানবতাবোধ (humanism) এক সুচেতন ভাবের রাজ্যে আমাদের পৌঁছে দেয়, একমাত্র ধনগোপাল-এর 'চিত্রগ্রীব' ছাড়া অন্য কোন বাঙালী লেখকের গদ্যরচনায় তা আজও দুর্লভ।* কিশোর সাহিত্যের রচনায় তাই এরাই আমাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ; এবং সমগ্র বাংলা সাহিত্যে দুই ঠাকুরের সঙ্গে তুলনীয় কোন গদ্য লেখকের নাম আজ পর্যন্ত সাহিত্য পাঠকের অভিজ্ঞতার বাইরে।

মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ আধুনিক বাংলা কবিতাকে এবং রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ† বাংলা গদ্য রচনাকে ক্লাসিক-এর মর্যাদা দিয়েছেন।

---

* জীবনানন্দের কবিতা এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। পুরাতন পদাবলী সাহিত্য এবং সমকালীন বাঙালী কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও অরুণ মিত্রের কবিতায় এই সুচেতন মুহূর্তের কাজ একাধিক বার পরিলক্ষিত হয়েছে।

বাংলা গদ্যসাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

† এবং সম্ভবতঃ প্রমথ চৌধুরী।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ','রাইকমল','জলসাঘর,-এ আমরা ক্লাসিক সাহিত্যের অঙ্কুর দেখেছি। শেষ পর্যন্ত কোন পরিণত ফসল পাওয়া যায়নি।